গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬১ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ১ - ৭ মে, ২০০৯ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

রাজ্যজুড়ে পালিত হল
মহান ২৪শে এপ্রিল

সল্টলেক কমিউনে কমরেড শিবদাস ঘোষের মূর্তিতে কমরেড নীহার মুখার্জী মাল্যদান করছেন

প্রতি বছর ২৪ এপ্রিল ভারতের সর্বহারাশ্রেণী ও মুক্তিকামী জনসাধারণের জীবনে বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে দেখা দেয়। এই দিনটিতে শোষণমুক্তির প্রয়োজনে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ মুষ্টিমেয় সহযোদ্ধাকে নিয়ে একটা যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল হিসাবে ১৯৪৮ সালের ২৪শে এপ্রিল এস ইউ সি আই দলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর থেকেই শোষিতশ্রেণী ও তার দল এস ইউ সি আই মুক্তির আকাঙ্খায় নতুন করে শপথ নেওয়ার জন্য প্রতি বছর এই দিনটি দৃঢ় বিশ্বাস ও নবচেতনায় পালন করে। এ বছর লোকসভা নির্বাচনের জন্য কোনও কেন্দ্রীয় সমাবেশ হয়নি। সর্বত্র এই দিবসটি বিকেন্দ্রীকৃতভাবে পালন করা হয়।

এবারও পার্টির সল্টলেক কমিউনে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন অনুষ্ঠানের জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং হলটি কর্মীরা গভীর আবেগে সুন্দর করে সাজিয়ে ছিলেন। লাল শালুতে মোড়া সুসজ্জিত মঞ্চে কমরেড শিবদাস ঘোষের ব্রোঞ্জের হাফ-বাস্ট মূর্তিটি অনন্য মর্যাদায় শোভা পাচ্ছিল। সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী গুরুতর অসুস্থতা নিয়েই কমরেড ঘোষের মূর্তিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তারপরে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত ও কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে উপস্থিত কর্মীরা ফুল ও মালা দিয়ে সর্বহারার মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মীরা 'সুমহান ২৪শে এপ্রিল' ও সর্বহারার মহান নেতার উপর রচিত গান দু'টি পরিবেশন করেন।

কমরেড নীহার মুখার্জী অসুস্থতার জন্য বলতে না পারায় কমরেড সুকোমল দাশগুপ্তকে বলতে অনুরোধ করেন। শারীরিকভাবে সুস্থ না থাকলেও কমরেড দাশগুপ্ত সাধারণ সম্পাদকের অনুরোধে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেন ও গভীর শ্রদ্ধায়-আবেগে আজকের দিনটির গুরুত্ব ও কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবন সংগ্রাম নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের পর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত'র ভাষণ

আজ ২৪শে এপ্রিল, ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এ দেশের মাটিতে একটি সঠিক শ্রমিকশ্রেণীর দলের অনুপস্থিতিজনিত কারণে কমরেড শিবদাস ঘোষ মুষ্টিমেয় সহযোদ্ধাদের নিয়ে ১৯৪৮ সালের ২৪শে এপ্রিল একটি সঠিক মার্কসবাদী দল গঠনের লক্ষ্যে তাঁর যাত্রা শুরু করেন।

তিনি বিশ্লেষণ করে দেখান, সি পি আই দলটি নামে কমিউনিস্ট হলেও চরিত্রগত দিক থেকে একটি অ-শ্রমিকশ্রেণীর, পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর দল হিসাবে গড়ে উঠেছে। এটা এই কারণে নয় যে, সিপিআই দলের নেতারা মার্কসবাদের ক্লাসিক্স সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, এরকম কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। মার্কসবাদের ক্লাসিকস এই নেতাদের পড়া ছিল। আমরা জানি, বই পড়ে অনেক জিনিস শেখা যায়, মার্কসবাদ সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়, এমনকী মুখস্থও করা যায়, কিন্তু মার্কসবাদের বিপ্লবী শিক্ষাগুলি আত্মস্থ করা যায় না। তার জন্য দরকার, জীবনের সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে মার্কসবাদী আদর্শের ভিত্তিতে সংগ্রাম পরিচালনা করা। সেই সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে সিপিআই নেতাদের ব্যর্থতা ছিল। সিপিআই দলের তাঁরাই সদস্য হতে পেরেছেন, যাঁরা কমিউনিজমকে সমর্থন করে মাসে মাসে দলের চাঁদা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে এস ইউ সি আই দলের সদস্য তিন রকম। একটা হচ্ছে, যাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় বিশ্বাস করেন এবং নিয়মিত দলের চাঁদা দেন, তাঁরা আবেদনকারী সদস্য। যাঁরা দল, বিপ্লব ও শ্রেণীর সাথে ব্যক্তিস্বার্থের সংঘাতের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থকে গৌণ এবং দল, বিপ্লব ও শ্রেণীস্বার্থকে মুখ্য করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের বলা হয় দলের মেম্বার বা সদস্য। আর, যাঁরা দল বিপ্লব ও শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিকে বিলীন করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদেরই বলা হয় স্টাফ মেম্বার। এস ইউ সি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হতে হলে প্রত্যেককেই স্টাফ মেম্বার হতে হয় এবং দলের রাজ্য কমিটির ক্ষেত্রে অন্তত রাজ্য সম্পাদকের ক্ষেত্রে স্টাফ মেম্বার হওয়ার প্রশ্নটি যুক্ত।

ভারতের বিপ্লবের স্তর নির্ণয়ের প্রশ্নেও সিপিআই মনে করত, ভারতবর্ষের বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব। কমরেড শিবদাস ঘোষ সেখানে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, ভারতবর্ষের বিপ্লব পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ১৯২৫ সালেই মহান স্ট্যালিন দেখিয়েছিলেন,

আটের পাতায় দেখুন

কংগ্রেস-সিপিএম বলছে মন্দা ঠেকানো হয়েছে
অথচ তীব্র মন্দার কোপে সাধারণ মানুষ জর্জরিত

কংগ্রেস নেতারা একটা কথা খুব জোরের সাথে বলছেন যে, বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রভাব যখন উন্নত-অনুন্নত সমস্ত দেশেই মারাত্মকভাবে পড়েছে, তখন একমাত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী অনুসৃত সফল নীতির কারণেই নাকি ভারতে তার প্রভাব অনেকটা আটকানো গিয়েছে। জি ডি পির অঙ্ক বাড়া বা দেশে কোটিপতি বা মহাধনীর সংখ্যা বাড়ার নিরিখে সাধারণ মানুষ অর্থনীতির বিচার করেন না।

ভোটের বাজারে এখন যা-ই বলুন, গত বছরের নভেম্বর মাসে এক সভায় রতন টাটা, মুকেশ আম্বানি প্রমুখের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছিলেন, "বিশ্বব্যাপী মন্দার কারণে বিদেশি বিনিয়োগ আসায় ঘাটতির জন্য ভারতবর্ষের অর্থনীতি বড় আঘাতের মুখে পড়বে। এই অবস্থায় দেশের শিল্পপতিদের হাঁটু যেন কাঁপতে না থাকে। দেশের কর্পোরেট সেক্টর ও ব্যাঙ্ককে এই আঘাতের সামনে পড়তে হবে সবচেয়ে বেশি।" বলাবাহুল্য, এরপরই ২০ নভেম্বর ২০০৮, ভারতের শেয়ারবাজারের সূচক আচমকা ২০,৮৭৩ থেকে নেমে ৮,৫৪১ হয়ে দাঁড়ায়। যাঁরা তাঁদের সামান্য সঞ্চয় শেয়ারবাজারে বা মিউচুয়াল ফান্ডে রেখেছিলেন, তাঁরা মার খান সবচেয়ে বেশি। আজও শেয়ারবাজার সেই আঘাতের রেশ কাটাতে পারেনি।

মন্দার মারাত্মক প্রভাব পড়ছে শিল্পক্ষেত্রে
লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই হচ্ছে

সংখ্যাতত্ত্বের কারচুপি করে কংগ্রেস নেতারা যাই বলুন না কেন, বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, দেশের সমগ্র অর্থনীতিতেই বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী মন্দার প্রভাব পড়েছে মারাত্মকভাবে। শিল্পক্ষেত্রে তার প্রকাশ ঘটছে প্রধানত ব্যাপকহারে ছাঁটাই ও কর্মসংকোচনের মধ্য দিয়ে। বিগত কিছুদিন ধরে আমাদের শোনানো হচ্ছিল, রপ্তানিভিত্তিক শিল্পায়নের বাণী। বলা হচ্ছিল, দেশে বিক্রির বাজার থাক না থাক, ভারতবর্ষের শিল্পদ্রব্য বিদেশের বাজারে বিক্রি করার লক্ষ্যে শিল্প গড়া হবে। অথচ দেখা যাচ্ছে, মন্দার আঘাতে রপ্তানি বাজার মার খেয়েছে কমবেশি ১৬ শতাংশের মতো। ফলত, দেশে-বিদেশে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার সাময়িক বাড়বাড়ন্তের ফলে সিমেন্ট, লোহার বিক্রি ও রপ্তানি যতটুকু বেড়েছিল, তা মুখ থুবড়ে পড়েছে। অন্যদিকে মার খেয়েছে প্রধানত রপ্তানি-নির্ভর বস্ত্র শিল্প, রেডিমেড পোষাকশিল্প, হিরে পালিশ ও জড়োয়া গহনাশিল্প, চর্মশিল্প, ট্যুরিজম প্রভৃতি ক্ষেত্র। তার ওপর তথ্যপ্রযুক্তি এবং বি পি ও ক্ষেত্র, যা প্রধানত বিদেশ থেকে পাওয়া অর্ডারের ওপর চলে, তাও মার খেয়েছে। ফলে এসব শিল্পে উৎপাদন কমানো শুরু হয়েছে। কাপড়ের কলগুলিতে বর্তমানে ২৫ শতাংশ উৎপাদন ছাঁটাই করা হয়েছে। দেশের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার ২০০২ সাল থেকে যা ছিল ৯ শতাংশের কাছাকাছি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের অনুমান, ২০০৯ সালে তা কমে ৬ শতাংশে দাঁড়াবে। ৮ নভেম্বর ২০০৮, ইকনমিক টাইমসের রিপোর্ট অনুযায়ী, বস্ত্রশিল্পে পূর্ববর্তী ছয় মাসে ৭ লক্ষ মানুষের কাজ চলে গিয়েছে এবং আগামী ছয় মাসে আরও ১২ লক্ষ মানুষ কাজ হারাতে পারে।

অর্থলগ্নি ক্ষেত্র ও শেয়ারবাজার থেকে শুরু করে, চক্রাকারে মন্দার আঘাত এসে পড়েছে মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প, বিমান পরিবহন, ধাতু শিল্প, ঢালাই শিল্প সহ সমস্ত ধরনের শিল্পে। বিমান শিল্পে কর্মচারী আন্দোলনের ফলে ছাঁটাই না করতে পারলেও মালিকরা বেতন কমিয়ে দিয়েছে। যে কংগ্রেস বলছে, ভারতে মন্দার প্রভাবকে তারা নাকি ঠেকিয়ে রেখেছে, সেই কংগ্রেসের বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় শিল্পমালিকদের বলছেন, আপনারা ছাঁটাই করবেন না, বরং বেতন কমিয়ে দিন। কী চমৎকার প্রস্তাব! শিল্পপতিদের তিনি বলছেন না যে, মন্দার দায় কিছুটা হলেও আপনারা নিন, আপনারা লাভ কম করুন। তিনি যা বলেছেন, তার মানে হল, শ্রমিক-কর্মচারীদের কম পয়সায় খাটিয়ে আপনারা পুরো লাভ উসুল করে নিন। জনদরদীই বটে! পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানের অন্যতম ক্ষেত্র হল ঢালাই শিল্প। সেই ঢালাই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র, এদেশের শেফিল্ড বলে খ্যাত হাওড়া শিল্পাঞ্চল শ্মশান হয়ে গিয়েছে। অ্যাসোসিয়েসন অব ইন্ডিয়ান ফোর্জিং ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি বিদ্যাশঙ্কর কৃষ্ণান বলেছেন, আগামী দিনে ঢালাই শিল্পে উৎপাদন ৭০ শতাংশ কমতে পারে, যার ফলে কাজ হারাবে ৫০,০০০ শ্রমিক। টাটা মোটরস পশ্চিমবঙ্গে যখন ন্যানো গাড়ি উৎপাদনের দ্বারা নতুন শিল্পবিপ্লবের খোয়াব দেখাচ্ছে ও টাটার দোসর সি পি এম শিল্পায়নের গাওনা গাইছে, তখনই টাটারা তাদের পুনের কারখানা ও জামশেদপুরের গাড়ির কারখানায় দফায় দফায় কাজ বন্ধ রেখেছে। সপ্তাহে কাজের

দুয়ের পাতায় দেখুন

পুঁজিবাদী মন্দার কোপে মানুষ জর্জরিত

একের পাতার পর

দিন কমিয়ে দিয়েছে গাড়ি নির্মাতা অশোক লেল্যান্ড। পশ্চিমবঙ্গের শালবনীতে এসইজেড এলাকায় জমি নিয়েও জিন্দালরা ইস্পাত কারখানা করেনি, কারণ ধাতু শিল্পের বাজারে মন্দা। এসব ক্ষেত্রে কত লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছে, তার সঠিক হিসাব দেশের সরকার রাখে না, দেয়ও না। একটা হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে, মন্দা শুরু হওয়ার কয়েক মাসেই ডিসেম্বর ২০০৮-এর মধ্যে কাজ হারিয়েছে ৫ লক্ষ মানুষ। কেবল শিল্পক্ষেত্রেই নয়, মন্দার আঘাত এসে পড়েছে কৃষিক্ষেত্রেও। বিশেষত তুলো চাষ, যা দক্ষিণ ভারতের বিরাট এলাকার মানুষের জীবিকার উপায়, বস্ত্রশিল্পে মন্দার কারণে সেই তুলোর চাহিদা গেছে কমে এবং দামও কমে গিয়েছে। অথচ চাষের উপকরণের খরচ প্রতি বছর বাড়ছে লাফ দিয়ে দিয়ে। চাষি চাষের মরশুমে টাকা ধার করে চাষ করছে, কিন্তু ফসলের উপযুক্ত দাম না পাওয়ায় ধারের টাকা শোধ করতে পারছে না। আত্মহত্যা করা ছাড়া তার আর পথ থাকছে না। এই অবস্থাটা চলছিল বছর পনের আগে থেকে। বি বি সি-র হিসাব মতো ১৯৯৭ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত ভারতে ২ লক্ষ চাষি আত্মহত্যা করেছে। বর্তমানে বিশ্বপুঁজিবাদী মন্দা এসে সেই সঙ্কটকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে মন্দার আঘাতে চাষি মরছে

প্রাক-স্বাধীনতাযুগে, ১০৫ বছর আগে, দেশভক্ত অর্থনীতিবিদ সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁর বিখ্যাত 'দেশের কথা' বইতে ইংরেজ শাসনে দেশের সাধারণ মানুষের, বিশেষত কৃষকের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, ''অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনু ক্ষীণ''। ইংরেজ গিয়েছে, ভারত স্বাধীন হয়েছে ৬২ বছর, অথচ সেদিন অনশনে যারা ক্ষীণতনু হয়েও বেঁচে ছিল, এখন তারা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে হাজারে হাজারে। দেশের মধ্যে উন্নত রাজ্য বলে প্রচারিত মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, কেরালা, পাঞ্জাব ছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গে চাষির আত্মহত্যা আজ একটি সুপরিচিত ঘটনা। কিন্তু কেন চাষি আত্মহত্যা করছে? কেন চাষের খরচ জোগাতে ঋণ নিয়ে চাষি ঋণ শোধ করতে পারছে না? কারণ চাষি মরশুমে ফসলের দাম পাচ্ছে না। লক্ষ করলেই দেখা যাবে, মহারাষ্ট্রে আত্মহত্যা করছেন প্রধানত সেই চাষিরাই, যাঁরা বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল তুলোর চাষ করেছেন।

মহারাষ্ট্রে ২০০৪ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত চার বছরের মধ্যে তিন বছর চাষির আত্মহত্যার সংখ্যা বছরে চার হাজার ছাড়িয়েছে। অর্থাৎ, তিন বছরে বারো হাজারের বেশি চাষি আত্মহত্যা করেছে। এই হিসাব দিয়েছে ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো। এছাড়া ঋণের ফাঁদে পড়ে চাষির আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা ঘটছে অন্যান্য রাজ্যেও, যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কংগ্রেসশাসিত অন্ধ্রপ্রদেশ। এই রাজ্যটিও চাষির বধ্যভূমি হিসাবে এখন কুখ্যাত। কেন চাষিরা আত্মহত্যা করছে? অতীতে চাষির দুঃখ ছিল মর্মান্তিক। স্বদেশি কবি গেয়েছিলেন ''তোরা শুধু চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয়।'' আজ স্বাধীন দেশের চাষি প্রাণের মালিকও থাকতে পারছে না কেন? কারণ, সরকারের উদারীকরণ নীতির ফলে বিদেশি একচেটিয়া কৃষি ব্যবসায়ীরা সার, বীজ, কীটনাশক থেকে শুরু করে চাষের প্রতিটি উপকরণের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। অথচ ফসলের দাম পাওয়ার ক্ষেত্রে চাষি কেবল কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ী ও তাদের দালাল ফড়েদের হাতেই বাঁধা নয়, সাথে সাথে বিশেষত, ক্যাশক্রপের ক্ষেত্রে (শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত কৃষিপণ্য, যেমন তুলো, পাট বা আখ) তারা শিল্পপতিদের হাতে এবং সেই সূত্রে শিল্পপণ্যের বাজারের হাতে বন্দি। খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করে যে চাষি, সেও বাজারের হাতে বন্দি, একথাও সত্য। কিন্তু ফসল ধরে রাখার আর্থিক ক্ষমতা থাকলে, সে অন্তত ফসলের কিছুটা নিজে ভোগ করতে পারে, কিন্তু ক্যাশক্রপ উৎপাদক চাষির সেটুকু সুযোগও নেই। তার ওপর চাষীদের জীবনে মন্দার আঘাত শিল্পশ্রমিকের চেয়ে কম নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বব্যাপী মন্দার আঘাত থেকে শিল্প বা কৃষি কিছুই বাদ যায়নি। কংগ্রেস নেতারা যাই বলুন, মানুষ নিজের জীবন দিয়ে প্রতিমুহূর্তে তা টের পাচ্ছেন।

পরিষেবা ক্ষেত্রে সরকারের ধীরে চলো নীতির পিছনে পুঁজির স্বার্থই মূল

সি পি এম ভোটের মুখে বলছে, তারা বাধা দেওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার চাইলেও ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদি শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগের দরজা পুরোপুরি খুলে দিতে পারেনি। তাই দেশের অর্থনীতিতে বিশ্বপুঁজিবাদের মন্দা যতটা পড়তে পারত, ততটা পড়েনি। কতটা পড়তে পারত, আর কতটা পড়েনি, তা নিয়ে নানা মত থাকতে পারে। কিন্তু একথা ঠিক, পরিমাণে মার্কিন সরকারের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও, একইভাবে ভারত সরকারও মন্দা আটকাতে সরকারি তহবিলের টাকা বাজারে ঢেলে বা ব্যাঙ্ক থেকে সস্তায় ঋণ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে বাজারে চাহিদা বাড়াবার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে দফায় দফায় রেপো রেট কমিয়ে, ব্যাঙ্ক ঋণে সুদ কমিয়ে, কিংবা সরাসরি সরকারি তহবিল থেকে ভরতুকি বা সাহায্য হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার মালিকদের তিন লক্ষ কোটি টাকা দিয়েছে। যে সরকার শিক্ষা, জনস্বাস্থ্যে টাকা দেওয়ার সময় অর্থাভাবের দোহাই দেয়, জনগণকে সস্তায় চাল গম দেওয়ার দায়িত্ব এক কথায় ঝেড়ে ফেলে, তারা কিন্তু মালিকদের স্বার্থ দেখার ক্ষেত্রে লাজলজ্জার বালাই রাখে না। কারণ ভারতীয় রাষ্ট্রটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাই এখানে শাসকদের কাছে মূল, সে ডান-বাম যে সরকারই হোক না কেন। সি পি এমও তার ব্যতিক্রম নয়। সি পি এম সমর্থিত সংযুক্ত মোর্চা সরকার রেশন তুলে দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তারপর বাস্তবে তা তুলে দেওয়ার কাজটা শুরু করে বিজেপি। তারই ধারাবাহিকতায় সি পি এমের সমর্থনের জোরে টিকে থাকতে থাকতেই কংগ্রেস রেশনব্যবস্থার কবরে শেষ পেরেকটা ঠুকেছে। সি পি এম দাবি করছে যে, তারা নাকি বিদেশি পুঁজির অবাধ প্রবেশের ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে রুখে দিয়েছে। এটা অর্ধসত্য, যা মিথ্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর। সি পি এম বাইরে মৌখিক বিরোধিতা করেছে, আর তলে তলে সি পি এমের সমর্থন নিয়েই ধীরে ধীরে ভারত সরকার ব্যাঙ্কশিল্পে শতকরা ৪৯ শতাংশ ও বীমাশিল্পে ২৬ শতাংশ বিদেশি পুঁজির প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে এবং সেটা বাড়াবার চেষ্টা করছে। ভারত সরকার দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটি বিদেশি পুঁজির কাছে খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে নীতিগত আপত্তি না করলেও ভারতীয় পুঁজির স্বার্থেই 'ধীরে চলো' নীতি নিয়ে চলছে। যেমন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারতীয় পুঁজিপতিদের তারা সরাসরি বিদেশি পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতার মুখে ফেলে দিতে চাইছে না। এর সাম্প্রতিকতম নিদর্শন হল স্টেনলেস স্টিল। মন্দার বাজারে বিদেশি কোম্পানিগুলি ভারতে ভরতুকি দিয়ে সস্তায় স্টেনলেস স্টিল বিক্রি করছিল। তা দেশিয় পুঁজিপতিদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাওয়ায় ভারত সরকার ২৪ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে এক ঘোষণায় সস্তাদরে স্টেনলেস স্টিল আমদানির ওপর শাস্তিমূলকভাবে টনপ্রতি ১২ থেকে ১১০০ ডলার বিশেষ শুল্ক চাপিয়েছে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ভারতীয় পুঁজির স্বার্থ ও ক্ষমতা রয়েছে বিদেশি পুঁজির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাজার দখল করার, সেসব ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ভারত সরকার বিদেশি পুঁজির জন্য দরজা খুলে দিয়েছে, যেমন,

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রবীন পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই-এর পুরুলিয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জহর ব্যানার্জী গত ১২ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭ টায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। ৩১ মার্চ তিনি কলকাতার বাঙুর হাসপাতালে মস্তিষ্কে টিউমার অপারেশনের জন্য ভর্তি হন। ৭ এপ্রিল অপারেশনের পর থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে ও নানা জটিলতার সৃষ্টি হতে থাকে। অবশেষে ১২ এপ্রিল তাঁর জীবনাবসান হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

কমরেড জহর ব্যানার্জী ১৯৬৭ সালে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর বিধানসভার নির্বাচনী কাজের মাধ্যমে দলের সাথে যুক্ত হন। ঐ সময়ে রঘুনাথপুর শহরে বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলন ও রঘুনাথপুর কলেজে ডিএসও-র উদ্যোগে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলন এলাকার গরিব সাধারণ মানুষ, বিশেষত যুবকদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এরই প্রভাবে তিনি দলের কাজে সক্রিয় অংশ নেওয়া শুরু করেন। এ সময়ই তিনি দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সদস্য কমরেড প্রীতীশ চন্দ ও বর্তমান সদস্য কমরেড সুকোমল দাশগুপ্তের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮৭ সালে দলের পুরুলিয়া জেলা সম্মেলনে তিনি জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এর কিছুকাল পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন বিপিটিএ-র পুরুলিয়া জেলার সহসভাপতি ছিলেন। জেলার শিক্ষক আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই অসুস্থতা তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। দলের সমস্ত কর্মকাণ্ড, তথা গরিব মানুষের স্বার্থে গড়ে ওঠা প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যতটা সম্ভব সম্পৃক্ত থাকার চেষ্টা করতেন। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর গভীর দরদবোধ।

তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়েই নেতৃবৃন্দ হাসপাতালে পৌঁছে যান। দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে প্রয়াত কমরেডের মরদেহে মাল্যদান করেন রাজ্য কমিটির অফিস সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষ। এরপর বিপ্লবী অভিনন্দনের মধ্য দিয়ে তাঁর মরদেহ পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ১৩ এপ্রিল রঘুনাথপুর শহরে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড জহর ব্যানার্জী লাল সেলাম।

ভয়াবহ লোডশেডিং-এ রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষের জীবন জেরবার। উৎপাদন বন্ধ। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা বন্ধ। এমনকী হাসপাতালে জরুরি অপারেশন পর্যন্ত বন্ধ থাকছে। লোডশেডিং বন্ধে রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত অপদার্থতার প্রতিবাদে ২৪ এপ্রিল এসপ্ল্যানেডে এস ইউ সি আই প্রবল বিক্ষোভ দেখায়। বিদ্যুৎমন্ত্রীর কুশপুতুলে আগুন দিচ্ছেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী।

সিপিএম নেতার চক্রান্তে বিদ্যুৎহীন মল্লিকঘাট ফুলবাজার

১১ এপ্রিল, এশিয়ার বৃহত্তম মল্লিকঘাট ফুলবাজার পুড়ে যাওয়ার বর্ষপূর্তির দিনটিকে ফুলচাষি-ব্যবসায়ীরা ফুলবাজারে এক সমাবেশের মধ্য দিয়ে 'কালাদিবস' হিসাবে পালন করেন। বক্তব্য রাখেন, বিধায়ক তারক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক মদন মিত্র, এস ইউ সি আই-এর রাজ্য নেতা সদানন্দ বাগল, সারা বাংলা বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতির সহসভাপতি অমল মাইতি, সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি ভানুচরণ সাউ।

গত বছর এই দিনটিতে ফুলবাজার বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বাজারে বিদ্যুতের আলো নেই, নেই পানীয় জল, পর্যাপ্ত শৌচাগার, মাথার উপর আচ্ছাদন কিংবা পয়ঃপ্রণালী ও জঞ্জাল সাফাইয়ের ব্যবস্থা। অথচ প্রতিদিন প্রতি চাষির কাছ থেকে ৭ টাকা, প্রতি দোকানদারের কাছ থেকে বর্গমিটার পিছু ১০৪ টাকা মাসিক ভাড়া আদায় করে চলেছে পরিচালন সমিতি।

কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অশোক গিরি ও কৃষ্ণচন্দ্র বেরা বলেন, মল্লিকঘাট ফুলবাজার পরিচালন সমিতির সভাপতি সিপিএম নেতা সুধাংশু শীল চক্রান্ত করে বাজারে বিদ্যুৎ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছেন। ২১ মার্চ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ওমবুড্‌সম্যান সিইএসসি-কে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার নির্দেশ দিলেও সিইএসসি নানা অজুহাতে টালবাহানা করছে। অবিলম্বে বিদ্যুৎ দেওয়া না হলে কমিটি ফুলচাষি ব্যবসায়ীদের নিয়ে আমরণ অনশন করতে বাধ্য হবে বলে অশোকবাবু জানান।

ঐতিহাসিক মে দিবস নিয়ে এসেছে সংগ্রামের নতুন বার্তা

পয়লা মে, মে দিবস। শ্রমিকশ্রেণীর কাছে এই দিনটি আন্তর্জাতিক সংহতি দৃঢ়তর করা, শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর এবং পুঁজিবাদবিরোধী সর্বহারা বিপ্লব সফল করে গণমুক্তি অর্জনের শপথ নেওয়ার দিন। প্রতি বছর বিশ্বের নিত্যনতুন সমস্যার প্রেক্ষাপটে মে দিবস সংগ্রামের নতুন বার্তা নিয়ে আসে। শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর কাছেও একথা অজানা নয়। এ কারণে পুঁজিপতিশ্রেণী, তাদের রাষ্ট্র ও সরকার সর্বদা মে দিবসের প্রাণসত্তা ধ্বংস করতে এই দিনটিকে নিছক ছুটি উপভোগ, নিছক আনন্দ উৎসবে পরিণত করতে সচেষ্ট থাকে। অন্যদিকে, শ্রমিকস্বার্থের কথা বলতে বলতে শ্রমিকদরদের নামাবলি গায়ে চাপিয়ে যারা শ্রমিক আন্দোলনের ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে নানা প্রকার সুবিধাবাদী চিন্তাভাবনায় জড়িয়ে ফেলে তাকে বিপথগামী করে, শ্রমিকস্বার্থকে মালিকশ্রেণীর পায়ে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য করে, তাদের সম্পর্কেও শ্রমিকদের সজাগ থাকতে হয়। শ্রমিকশ্রেণীর দীর্ঘ সংগ্রামে অর্জিত এই অভিজ্ঞতা আসন্ন মে দিবস পালন করতে গিয়ে স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

এ বছর আমরা এমন এক সময়ে মে দিবস পালন করতে যাচ্ছি, যখন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে পুঁজিবাদ ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। অর্থ, ঐশ্বর্য, পেশিশক্তির সব দম্ভ যেন চুরমার হয়ে যাচ্ছে। এ ঘটনা শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আর একবার প্রমাণ করছে যে, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে যত প্রবল শক্তিমান বলে মনে হোক না কেন, আসলে অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে সে নিতান্তই ক্ষয়িষ্ণু, পচনশীল।

বিশ্বপুঁজিবাদের বর্তমান সংকট আচমকা আসেনি। বহু পূর্ব থেকেই তার অশনিসংকেত দেখা যাচ্ছিল। পুঁজিবাদী এই সংকট হল বাজারসংকট, অর্থাৎ বিক্রয়ের মাল মজুত আছে, জনগণের কেনার প্রয়োজনও আছে, কিন্তু কেনার সামর্থ্য নেই। দীর্ঘ বছরব্যাপী পুঁজিপতিদের শোষণ-শাসনে অগণিত মেহনতি মানুষ, যারা প্রকৃত ক্রেতা — তারা আজ নিঃস্ব, হতদরিদ্র। তাদের কেনার ক্ষমতা নেই। তাই বিক্রির বাজার নেই। এটাই পুঁজিবাদকে ধরাশায়ী করেছে। তাই এ সংকট পুঁজিবাদের নিজেরই তৈরি করা সংকট, তার অন্তর্নিহিত কারণের ফল। কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার দোষ শ্রমিকশ্রেণীর উপর চাপিয়ে আত্মরক্ষার যতই চেষ্টা পুঁজিবাদ করুক না কেন, সংকট যে তার শোষণেরই ফল — এটা আবার প্রমাণিত হল। তাই, যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে, শোষণ থাকবে, তার পরিণতিতে দারিদ্র, বেকারি, বাজারসংকটও থাকবে। এ কারণে মে দিবসের আহ্বান হল, পুঁজিবাদকে উচ্ছেদের আহ্বান।

২০০৯ সালে বিশ্বমন্দার যে কঠিন মুহূর্তে মে দিবস এসেছে, সেইসময়ে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর বাস্তব অবস্থাটা কেমন? সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদ সর্বদাই সংকট নিরসনের জন্য সংকটের সমস্ত বোঝা শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। সে কারণে মূল আক্রমণ নেমে আসে শ্রমিকশ্রেণীর কাজ ও মজুরির উপর। আই এল ও-র হিসাব মতো দেখা যাচ্ছে, ২০০৬ সালে বিশ্বে বেকার ছিল মোট শ্রমশক্তির ৬.১ শতাংশ, অর্থাৎ ১৮ কোটি ৭০ লক্ষ; ২০০৭ সালে তা বেড়ে হল ১৮ কোটি ৯৯ লক্ষ এবং আইএলও-র হুঁশিয়ারি ২০০৯ সালের শেষে এই সংখ্যা পৌঁছুবে ২৩ কোটিতে। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বে প্রতি মিনিটে ৫ জন শ্রমিক কাজ হারাচ্ছেন। আইএলও'র আর একটি হিসাব মতে — ২০০৭ সালে বিশ্বে ৪৮ কোটি ৭০ লক্ষ শ্রমিকের (১৬.৪ শতাংশ) দৈনিক মাথাপিছু আয় দারিদ্রসীমার নিচে, অর্থাৎ দৈনিক ১ ডলারের কম; আর, ১৩০ কোটি শ্রমিকের (৪৩.৫ শতাংশ) মাথাপিছু দৈনিক আয় ২ ডলারের কম। ২০০৮ সালে আরও ১৩-১৫ কোটি শ্রমিক দারিদ্রসীমার নিচে নেমে গিয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের হুঁশিয়ারি, মন্দা চলতে থাকলে ২০০৯ সালে আরও ৫ কোটি ৩০ লক্ষ দারিদ্রসীমার নিচে নেমে আসবে। আর খাদ্য ও জ্বালানির দাম কমানো না গেলে আরও ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ এর সাথে যুক্ত হবেন। বিশ্বব্যাঙ্কের হিসাব মতো মন্দার এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আগামী ৬ বছরে শিশুমৃত্যুর পরিমাণ ১৪-২৮ লক্ষ বেশি হবে।

সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা কেমন? ২০০৭ এর ডিসেম্বরে যে মন্দার শুরু, তার ধাক্কায় ২০০৯ সালের শেষ অবধি কাজ হারানো শ্রমিক-কর্মচারীর মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ৫ কোটিতে। সাম্প্রতিককালে আমেরিকায় কাজ হারানোর সংখ্যা ৩৬ লক্ষেরও বেশি। সেখানে ১৫ লক্ষ শিশু গৃহহীন। বিবিসি নিউজ-এর সংগৃহীত তথ্য বলছে, পরিবারগুলির গৃহহীন হওয়ার মূল কারণ কাজ হারানো। আমেরিকায় এখন দুই-তৃতীয়াংশ পরিবার অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে বাস করছেন। কেউবা চিলেকোঠায়, কেউবা পরিবার নিয়ে একটা গাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। এ তো গেল সাধারণ মানুষের কথা। বিপরীতে মাত্র ৪০০ জন আমেরিকাবাসীর (০.০০০১ শতাংশ) সম্মিলিত আয় ২০০৬ সালে হয়েছে ১০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৫ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা। (তথ্যসূত্র ঃ আমেরিকার ট্যাক্স অথরিটি, ইন্টারন্যাশনাল রেভিনিউ সার্ভিস বা আইআরএস)। পুঁজিবাদী দুনিয়ার বৈষম্য, অবিচার ও করুণ পরিস্থিতি বুঝতে এটুকুই যথেষ্ট। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে, ব্রিটেন, জার্মানি, জাপান ইত্যাদি দেশের অবস্থা কী হতে পারে।

যে ব্রিটেন আইএমএফ-এর তহবিলে টাকা দিত, এবারে সে তহবিলের কাছে সাহায্যপ্রার্থী, জাপানে দীর্ঘদিন যাবৎ ভয়ঙ্কর মন্দায় উৎপাদন নিম্নগামী। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনেতারা ঘোষণা করে আসছে, মন্দা ভারতকে প্রভাবিত করতে পারবে না। কিন্তু বাস্তব অবস্থা কি তাই? সরকারি হিসাবে ভারতবর্ষে মোট শ্রমশক্তি ৪৫ কোটি ৮০ লক্ষ। এর মধ্যে ১৩ কোটি শিশুশ্রমিককে ধরা হয়নি। ধরা হয়নি অসংখ্য মা-বোনেদের, যারা পরিচারিকা ইত্যাদি কাজে রত আছেন। এই ৪৫ কোটি ৮০ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ৫.৭৩ শতাংশ শ্রমআইন অনুসারে নির্দিষ্ট বেতন কাঠামোর সুযোগ, বোনাস, পেনশন, পি-এফ ইত্যাদির সুযোগ পেয়ে থাকেন। অবশ্য প্রকৃত হিসাবে এই সংখ্যা অনেক কম। কারণ সংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের একটা বড় অংশ এখন ঠিকাশ্রমিক। বাকি যে কোটি কোটি অসংগঠিত শিল্পশ্রমিক — এদের নির্দিষ্ট কাজ, নির্দিষ্ট মাইনে, কাজের স্থায়িত্ব, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, পেনশন, বোনাস ইত্যাদির কোনও সুযোগই নেই। অর্থনৈতিকভাবে অনিশ্চয়তায় দিন কাটে এদের। এই সংখ্যার মধ্যেই রয়েছে ২৫ কোটি ৩০ লক্ষ কৃষিমজুর। এদের দুরবস্থাময় জীবনকাহিনী কারও অজানা নয়। অসংগঠিত ক্ষেত্রের এই বিপুল শ্রমবাহিনীর চরম দারিদ্র এদের ঘর থেকে ১৩ কোটি শিশুকে শৈশবে মজুরি দাসত্বের দিকে ঠেলে দিয়ে নিষ্ঠুর পুঁজিবাদের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করতে বাধ্য করেছে। মুনাফা শিকারিরা এদের দাস হিসাবে ব্যবহার করে। এমনকী যৌন ব্যবসায়ও তাদের নিয়োগ করা হয়। প্রসঙ্গত, পৃথিবীতে শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা ২৪ কোটি ৬০ লক্ষেরও বেশি। এরা বন্ডেড লেবার বা ক্রীতদাস। এদের নিয়ে চালানি ব্যবসা হয়। এমনকী শিশু সৈনিক হিসাবে যুদ্ধেও নিযুক্ত করা হয়। ভারতে গৃহপরিচারিকাদের আর এক করুণ দাসত্বের জীবন। এ দেশে অসংগঠিত শিল্পশ্রমিকরা নিরুপায় জীবনের বোঝা বইতে অক্ষম হয়ে ভবঘুরে শ্রমিক হিসাবে দেশান্তরীও হচ্ছে। একমাত্র উপসাগরীয় দেশগুলোতে ৩০ লক্ষ ভারতীয় শ্রমিক আছে যার ৭০ ভাগই অদক্ষ ও আধাদক্ষ শ্রমিক। তারা কদর্য পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। বিশ্বায়নের আক্রমণে ঋণের জালে জড়িয়ে এ পর্যন্ত দেড় লক্ষাধিক দরিদ্র কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে ভারতবর্ষে ভূমিহীন কৃষক বাড়ছে — বাড়ছে অসংগঠিত শিল্পশ্রমিক। এক-তৃতীয়াংশ ভারতবাসী মনুষ্যেতর জীবনযাপন করছেন। বিশ্বব্যাঙ্কের হিসাবে ৭৮ কোটি ভারতবাসীর মাথাপিছু দৈনিক আয় ৯ - ২০ টাকা। এদেশে ৫০ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। এই ভয়ঙ্কর, বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে আমরা মে দিবস পালন করতে যাচ্ছি।

একদিকে দেখা যাচ্ছে, তীব্র দারিদ্র, হাহাকার, অনিশ্চয়তা, জীবনযুদ্ধে পরাজিত শ্রমিকের আত্মহননের পথে পরিত্রাণের চেষ্টা, অপরদিকে চলছে এদের শ্রমে অর্জিত সম্পদের পাহাড় গড়ার নিষ্ঠুর খেলা। আজ ভারতীয় পুঁজিবাদ ও তার প্রবক্তারা গর্বিত যে, বেশ কিছু ভারতীয় পুঁজিপতি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীদের তালিকায় যুক্ত হয়েছেন এবং তাদের সংখ্যা জাপানের অনুরূপ পুঁজিপতিদের সংখ্যার থেকে কম নয়।

পরিসংখ্যানের ভোজবাজিতে মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা চলছে। দেখানো হচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতি শূন্যের কাছে পৌঁছেছে, অথচ বেশিরভাগ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের দাম দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। সরকারি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, সরকারি সংস্থাগুলো — যাদের লোকসানের জুজু দেখিয়ে এখন সরকার পুঁজিপতিদের কাছে জলের দামে বিক্রয় করতে চাইছে, ২০০৭-২০০৮ সালে তাদের নিট আয় ৭৯ হাজার ৭ শত ৩০ কোটি টাকা। মুনাফার হার ২০.৩ শতাংশ। ভারতবর্ষে মধ্যবিত্তের ভোগ্যপণ্যের শিল্পে মুনাফার হার গড়ে ২৫-৩০ শতাংশ। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার প্রশ্ন নয়, পুঁজিপতিদের মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধিই যে সরকার ও রাষ্ট্রের লক্ষ্য, তা এ থেকে পরিষ্কার হচ্ছে।

আর একটা দিক থেকেও বিষয়টিকে দেখা যায়। নির্দিষ্ট কিছু সরকারি ক্ষেত্রে ঠিকায় কাজ করানো আইনত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অথচ সরকারি কর্মক্ষেত্রে ৫ লক্ষ ৯০ হাজার কাজ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ঐ কাজ-হারানো শ্রমিকরা এখন কম মজুরিতে, প্রাপ্য সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে ঠিকা শ্রমিক হিসাবে কাজ করছেন। ঠিকা শ্রমিক (নিয়ন্ত্রণ ও বিলোপ) আইন, ১৯৭০ অনুসারে ঠিকাদার কিছু কিছু সুযোগ দিতে বাধ্য, কিন্তু তারা তা দিচ্ছে না। সরকারও উদাসীন। অর্থাৎ শ্রমিকদের বঞ্চনার কলাকৌশলে আইনকে পদদলিত করার ক্ষেত্রে সরকার এখন পথপ্রদর্শক। স্থায়ী ধরনের কাজের ক্ষেত্রে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও পুঁজিপতিরা সর্বত্র ঠিকায় কাজ করাচ্ছে, যেখানে মজুরি কম, কাজের সময় অনেক বেশি। শ্রমআইনে প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা না দিয়ে শ্রমিককে শোষণ করা কত সহজ সরল হয়ে গিয়েছে। শ্রমিক লুণ্ঠনের পরিমাপ করতে একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। এনটিপিসি-র তালচের ইউনিটে শ্রমিক সংখ্যা ছিল ২৬০০ জন। সব পদই স্থায়ী। সেখানে এখন ২০০০ জনকে ঠিকায় কাজ করানো হচ্ছে। স্থায়ী পদে আছে মাত্র ৬০০ জন। সেন্ট্রাল অথরিটি অব কন্ট্রাক্ট লেবার বোর্ড ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও খোদ দিল্লিতে নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লকে সরকারি কাজে নিযুক্ত সিপিডব্লুডি-র ইলেকট্রিসিয়ান, ওয়্যারম্যান, মেকানিক, ঝাড়ুদার, ফিটার, ছুতার ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত শ্রমিকরা সবাই ঠিকা শ্রমিক।

শ্রমবিরোধ আইন এখন কেতাবি বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের চটকলে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার। ত্রিপাক্ষিক চুক্তি লঙ্ঘন করে বছরের পর বছর প্রাপ্য বর্ধিত মজুরি মালিকরা দিচ্ছে না। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের সরকার উভয়ই মালিকদের প্রতি সদাশয়। ঠকছে শ্রমিক। শুধু তাই নয়, ঐ শ্রমিকদের প্রাপ্য পি এফ-এর ২০০ কোটি টাকা মালিকরা আত্মসাৎ করে বসে আছে। শ্রমিকরা দীর্ঘ আন্দোলনের ধারায় কয়েকমাস আগেও যে লাগাতার ধর্মঘট করলেন তাতে সিটু যোগ দেয়নি। এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, তারা চটকল মালিকদের বিরাগভাজন হতে চায়নি। রাজ্য সরকার - মালিক সমঝোতা এখানে পরিষ্কার।

ন্যূনতম মজুরি আইন আছে। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের পদ্ধতি পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনে সর্বসম্মতিভাবে ঠিকও করা হয় এবং পরে সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ের দ্বারা তাকে আরও উন্নত করাও হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কি তা গ্রাহ্য করে? ঐ পদ্ধতি অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বাম সরকার কি তার এক্তিয়ারভুক্ত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে? করে না। বরঞ্চ অনেক নিচে ন্যূনতম মজুরি সরকার ধার্য করে। তাও কার্যকর করার কোনও দায়বদ্ধতা অনুভব করে না সরকার। একটা উদাহরণই যথেষ্ট। বিড়ি শ্রমিকদের পঞ্চদশ শ্রমসম্মেলন অনুসরণ করে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করা না হলেও, রাজ্য সরকার কম হলেও যা ঠিক করেছে তা রাজ্যে চালু করেছে কি? করেনি। কেন করেনি? এর একটাই উত্তর — তাতে মালিকরা অসন্তুষ্ট হবে। অদ্ভুত এই যুক্তির আড়ালে লক্ষ লক্ষ বিড়ি শ্রমিককে বছরে পর বছর সরকার বঞ্চিত করছে। এর ওপর দেশের প্রান্তে প্রান্তে তৈরি হচ্ছে এস ই জেড, যেখানে দেশের কোনও শ্রমআইন কাজ করবে না। কাজের সময়সীমা নেই, ন্যায্য মজুরি নেই, মজুরি দাবি করাও বেআইনি। সেখানে কলুর বলদের মতো মুখ বুজে খাটতে হবে শ্রমিকদের। ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট ১৯২৬ অনুসারে শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠন, সরকারি রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদির যে অধিকার রয়েছে তা রাজ্যে কার্যকর হয় কি? এক্ষেত্রেও বঞ্চনা। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। রাজ্যের গৃহপরিচারিকাদের একটি ইউনিয়ন, যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৫/১৬ হাজার। ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য তাদের দীর্ঘ ৩ বছর অপেক্ষা করতে হচ্ছে। সরকারি টালবাহানায় তা চাপা পড়ে আছে। মূল কথা ঐ শ্রমিকদের স্বীকৃতি দিতে সরকারের দ্বিধা আছে। দ্বিধার কারণ শ্রমিকদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। রাজ্যে ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন করাই কঠিন। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক — বামপন্থার আড়ালে এ সরকার কাদের সেবক!

ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট। শপ্ অ্যান্ড এস্ট্যাব্লিশমেন্ট অ্যাক্টকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে শ্রমিকদের ১২/১৪ ঘণ্টা কাজ করানো হচ্ছে। ওভারটাইম পর্যন্ত চালু করা হচ্ছে না। এটা এখন রাজ্যে একটা প্রচলিত প্রথায় দাঁড়িয়েছে। সরকারের এসব গোচরের বাইরে? না, তা নয়। শাসক দলগুলি একদিন যেসব আইন কার্যকর করার দাবিতে শ্রমিকদের সংগঠিত করেছে, আজ ক্ষমতায় আসীন হয়ে তারাই তার বিরুদ্ধতা করছে, শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত, আইনসঙ্গত অধিকার হরণ করছে। এই চরম শোষণের বিরুদ্ধে আজ যখন যৌথ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন সর্বাধিক, তখন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ভাঙন ধরাচ্ছে শাসকশ্রেণী। তাদের দল ও সরকার ধর্ম, বর্ণ, প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতাকে নানা কৌশলে উস্কে দিয়ে শ্রমিক ঐক্যে ভাঙন ধরাতে তারা ব্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গেও তা ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক ঐক্য, সংহতি, তার আন্তর্জাতিকতাবাদের মহান আদর্শকে অনুধাবন, তার ঝাণ্ডাকে উচ্চে উড্ডীন রাখার মহান কর্তব্য নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে শ্রমিকশ্রেণীকে এগিয়ে আসতে হবে।

ওড়িশা নির্বাচন

গদির লালসায় মত্ত দলগুলির নীতিহীন জোট

ওড়িশায় লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে যথাক্রমে ১৬ ও ২৩ এপ্রিল। নির্বাচনের আগে রাজ্যের প্রধান দলগুলি গদির লোভে যে ঘৃণ্য রাজনীতি করেছে, তাতে ভোটের পর এদের মধ্যে যারাই ক্ষমতায় যাক, তার দ্বারা জনস্বার্থ রক্ষিত হতে পারে না। ভারতের শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত দুই দল, কংগ্রেস ও বিজেপি কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের সঙ্গে জোট বাঁধার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। বিজু জনতা দল (বিজেডি)-এর মতো ছোট অথচ প্রভাবশালী আঞ্চলিক দল, যারা গত ৯ বছর ধরে বিজেপির সঙ্গে এবং পরে অ-বিজেপি বিভিন্ন দলের সমর্থনে রাজ্য শাসন করেছে, নির্বাচনের পর ক্ষমতার ভাগ পাওয়ার লোভে তারা ভোটের আগেই কংগ্রেস ও বিজেপির সঙ্গে পুরোদস্তুর দরকষাকষি করেছে। বিজেপির সঙ্গী বলে বিজেডি-কে এতদিন 'অচ্ছুৎ' বলে এসে সিপিএম ও সিপিআই-এর মতো মেকি মার্কসবাদী দলগুলি ক্ষমতার লালসায় সেই অচ্ছুতেরই হাত ধরেছে। ভোট যত এগিয়ে এসেছে, এই সমস্ত ক্ষমতালোভী দলগুলির গর্জন এবং পারস্পরিক দোষারোপ তত তীব্র হয়েছে।

ওড়িশার সাধারণ মানুষ অপরিসীম দুর্দশায় জর্জরিত

ভোটপ্রচারের ময়দানে নেমে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিটি ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলই, রাজ্যের সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের সেবায় কে কতটা দড়, তাই নিয়ে বড় বড় বুলি আউড়েছে। কিন্তু দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতোই ওড়িশার সাধারণ মেহনতি মানুষ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দুঃসহ শোষণ-নিপীড়নে জর্জরিত। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ওড়িশায় নেহরুর আমলেও ব্যাপকহারে শিল্প-কল-কারখানা গড়ে ওঠেনি। পরবর্তীকালে কংগ্রেস সরকারের বহুল প্রচারিত 'হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে, হাজার দিনে হাজার শিল্প' স্থাপনের স্লোগান যেমন ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি সাম্প্রতিক বিজেডি-বিজেপি সরকারের আমলে দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহী 'মৌ' ব্যাপক হারে স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী শিল্প গড়ে ওঠেনি, বরং তা বহুজাতিক কোম্পানিগুলিকে রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় উর্বর কৃষিজমি দখলের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে। রাজ্যের হাতে গোনা ছোট ও মাঝারি শিল্পসংস্থাগুলিতে কর্মসংস্থানের যেটুকু সুযোগ ছিল, পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের দাপটে তাও আজ শেষ হতে বসেছে। প্রতিদিন একের পর এক শিল্পসংস্থা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সাথে সাথে কাজ হারাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ১০ বছরে ৩ হাজারের বেশি মাঝারি ও ছোট শিল্পসংস্থা বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারি ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ নেই বললেই চলে। লক্ষ লক্ষ সরকারি পদ বছরের পর বছর ধরে শূন্য পড়ে থাকা সত্ত্বেও পূর্বতন কংগ্রেস সরকার নতুন নিয়োগ বন্ধ রেখেছিল। সেই নীতি এখনও চলছে। অর্থসঙ্কটের অজুহাত তুলে বিজেডি নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার স্থায়ী চাকরি দিচ্ছে না। ফলে কারখানায় কাজ না পেয়ে মানুষ চাষবাসের কাজে ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছে।

কিন্তু ওড়িশার গ্রামগুলিতে পরিস্থিতি চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত ও ভয়াবহ। চাষের ওপর নির্ভর করে জীবনধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। কৃষিকাজের উপকরণের অত্যধিক দামবৃদ্ধি, বিশেষত সেচের ক্ষেত্রে 'পানি পঞ্চায়েত প্রকল্প' এবং বিদ্যুৎক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের ফলে কৃষিকাজ অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। একদিকে ফসলের দাম না পাওয়া, অন্যদিকে গ্রামীণ জোতদার-মজুতদার - কালোবাজারি - পুলিশ প্রশাসন ও শাসক দলের অনুগত গুণ্ডাবাহিনীর দুষ্টচক্র চাষির জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। এর উপর বিশ্বায়নের নীতি অনুসরণ করে সরকার কৃষি-ভর্তুকি তুলে নেওয়ায় চাষিদের সঙ্কট আরও বেড়েছে। চলতি বছরেই ওড়িশায় অন্তত ৫০ জন চাষির আত্মহত্যার খবর প্রকাশিত হয়েছে। আরও শত শত মানুষ মরছে এবং বন্যা-খরা-সুপার সাইক্লোনের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অসংখ্য মানুষ জীবন জীবিকা থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, ওড়িশা রাজ্যের কালাহান্ডি, বোলাঙ্গির ও কোরাপুটের মতো চূড়ান্ত পিছিয়ে পড়া জেলাগুলির অধিবাসীদের দৈনিক মাথাপিছু যতটুকু খাবার জোটে, তা আফ্রিকার দুর্ভিক্ষগ্রস্ত এলাকাগুলির থেকেও কম। ঐ রিপোর্টেই বলা হয়েছে, এইসব জেলার অধিবাসীদের মাথাপিছু আয় ও ক্রয়ক্ষমতা গত ১০ বছরে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ কমে গেছে। রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থাও যথেষ্ট সংকটজনক। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ওড়িশার অধিবাসীদের মাথাপিছু দৈনিক আয় গত ১০ বছর ধরে গ্রামীণ অঞ্চলে ১৮ টাকা ও শহরাঞ্চলে ২৫ টাকাতেই দাঁড়িয়ে আছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই শিশুমৃত্যু ও প্রসবকালীন মৃত্যুতে ওড়িশা দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। এর উপর শিক্ষা-স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের জন্য ওড়িশার সাধারণ মানুষ আজ তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

সর্বোপরি, দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার তথাকথিত শিল্পায়নের অজুহাতে দরিদ্র, নিপীড়িত জনগণের কাছ থেকে জোর করে জমি কেড়ে নিচ্ছে। কলিঙ্গনগরে টাটা কোম্পানি এবং জগৎসিংপুরে দক্ষিণ কোরিয়ার পস্কো গ্রুপ এইভাবে জমি দখল করতে গেলে সাধারণ মানুষ প্রতিরোধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। সেই প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিতে সরকারি প্রশাসন নির্মম আক্রমণ নামিয়ে এনেছিল দরিদ্র, মূলত আদিবাসী আন্দোলনকারীদের উপর। ঘটনাস্থলেই বেশ কয়েকজন নিহত হয়। গোটা দেশ এই ঘটনায় শিউরে উঠলেও শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর সেবাদাস ক্ষমতাসীন বিজেডি ওড়িশার মিত্তাল, বেদান্ত, কাশীপুর ইত্যাদি স্থানে একই ঘটনা ঘটায়। এরপর গোটা ওড়িশা কেঁপে ওঠে কন্ধমালে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি আর এস এস-বিজেপির বাধানো দাঙ্গায়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তার রক্ষক সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শোষিত-নিপীড়িত সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই পুঁজিপতিশ্রেণীর বিশ্বস্ত সেবক আর এস এস-বিজেপি যে এই দাঙ্গার ষড়যন্ত্র করেছিল, তা বলাই বাহুল্য। সেই একই উদ্দেশ্যে অতীতে তারা ওড়িশার খ্রিস্টান মিশনারি গ্রাহাম স্টেইনস ও তার দুই শিশুপুত্রকে পুড়িয়ে মেরেছিল। এই ঘটনার নৃশংসতায় আজও ওড়িশার বাতাস ভারি হয়ে আছে এবং অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক নিপীড়নে নিষ্পেষিত ওড়িশার সাধারণ মানুষকে এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ ও দাঙ্গার আতঙ্ক।

ক্ষমতালোভী দলগুলির প্রাক্-নির্বাচনী নাটক

সাধারণ মানুষের এই দুর্বিষহ অবস্থা প্রতিকারের বিষয়ে দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া দলগুলি কিংবা 'মার্কসবাদী' নামধারী বামপন্থী দলগুলির বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। প্রাক্ নির্বাচনী প্রচারে নেমে তারা জনগণের এই অবস্থার জন্য কে দায়ী — তাই নিয়ে একে অপরকে দোষারোপ করার নাটক করেছে এবং মানুষকে প্রতারিত করার চেষ্টা চালিয়েছে।

বিজেপি ও বিজেডি জোট ভেঙে যাওয়ার মধ্য দিয়ে ওড়িশার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে এক রাজনৈতিক নাটক। ব্যাপক কংগ্রেসবিরোধী হাওয়ায় পাল তুলে ২০০০ সালে রাজ্যে সরকারি ক্ষমতায় বসে বিজেডি-বিজেপি জোট একটানা ৯ বছর সরকার চালিয়ে গেছে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের পূর্বতন এনডিএ সরকারেরও শরিক ছিল বিজেডি এবং এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিজেপির সবচেয়ে বিশ্বস্ত জোটসঙ্গীদের অন্যতম ছিল এই দলটি। আসন্ন বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে আসন ভাগাভাগি নিয়ে এই দুই দলের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয় এবং পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির পর ৭ মার্চ বিজেডি সভাপতি, মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কে জোট ভাঙার কথা ঘোষণা করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি নবীন পট্টনায়ক পরিচালিত বিজেডি সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নেয় এবং সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন হারিয়েছে দাবি করে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু করার দাবি জানায়।

ওড়িশা বিধানসভার ১৪৭ জন বিধায়কের মধ্যে বিজেডির পক্ষে ছিলেন ৬১ জন। সরকার বাঁচাতে আরও ১২ জন বিধায়কের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। ফলে শুরু হয়ে গেল ঘোড়া কেনা-বেচার নোংরা খেলা। যে সিপিএম জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের জন্য বিজেডি সরকারকে দু'দিন আগেও উঠতে বসতে গালিগালাজ করত শুধু নয়, কন্ধমালের খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনীর ধর্ষণকারীদের আড়াল করার জন্য নবীন পট্টনায়কের পদত্যাগ পর্যন্ত দাবি করেছিল, তারা হঠাতই ভোল বদলে বিজেডির পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। কলিঙ্গনগর দাঙ্গার পর সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি বিজেডি-বিজেপি জোট সরকারকে এবং মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ককে যথাক্রমে 'গণহত্যাকারী' ও 'ক্রিমিনাল' আখ্যা দিয়েছিলেন। বিজেডি-বিজেপি জোট ভেঙে যাওয়ার পর ভুবনেশ্বরে সেই ইয়েচুরিকেই দেখা গেল হাসিমুখে নবীন পট্টনায়ককে সমস্ত রকম সমর্থনের আশ্বাস দিতে এবং তৃতীয় ফ্রন্টে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাতে। সিপিআই নেতা এ বি বর্ধন বিজু পট্টনায়ককে জোট রাজনীতির জনক আখ্যা দিয়ে, নবীন পট্টনায়ককে তাঁর সুযোগ্য সন্তান হিসাবে তুলে ধরেছেন। সিপিএম, সিপিআই ছাড়াও নবীন পট্টনায়ক কয়েকজন নির্দল, শরদ পাওয়ারের এনসিপি এবং শিবু সোরেনের জেএমএম-এর বিধায়কদের সমর্থনও আদায় করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, কয়েক মাস আগে কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারের এবং ঝাড়খণ্ডে কংগ্রেসের বিশ্বস্ত সাথী এই জেএমএম যখন ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝোড় এবং সুন্দরগড় জেলা তিনটিকে ওড়িশা থেকে আলাদা করে নিয়ে ঝাড়খণ্ডে যুক্ত করার দাবি তুলেছিল, তখন বিজেডি ওড়িশা ভাগের চক্রান্ত রুখতে জেএমএমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছিল। কিন্তু যখনই গদি বাঁচানোর প্রয়োজন এসে পড়ল, তখন সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘুরে বিজেডি জেএমএমের হাত ধরতে দ্বিধা করেনি। একদা বিজেডি-বিজেপি জোটের কঠোর সমালোচক এনসিপির শরদ পাওয়ারও নবীন পট্টনায়কের পাশে এসে দাঁড়ান। কয়েকজন বিক্ষুব্ধ বিজেপি বিধায়ককেও পাশে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে বিজেডি এবং শেষপর্যন্ত বিজেডির পক্ষে এসে গেছেন ৭৬ জন বিধায়ক, যদিও রাজ্যপালের কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার সময়ে খোদ বিজেডিরই কয়েকজন বিধায়ক সরে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এই ঘটনার পিছনে কোনও নীতি-নৈতিকতা নয়, চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বই কাজ করেছে। গোটা বিষয়টার পিছনেই বিপুল পরিমাণ কালো টাকার খেলা ছিল কিনা — তাই নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছে। উল্লেখ্য, এই সময়ে প্রচারমাধ্যমের সাহায্য নিয়ে বিজেডি নেতারা প্রচার করেন যে, এস ইউ সি আই বিধায়ক শম্ভুনাথ নায়েক বিজেডি সরকারকে সমর্থন জানিয়েছেন। এর প্রতিবাদ করে এস ইউ সি আই ওড়িশা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হয়, সম্পূর্ণ ঘটনাটিই অসত্য এবং ক্ষমতা দখলের নীতিহীন ও নোংরা এই খেলায় এস ইউ সি আই কোনওদিনই সামিল হতে পারে না।

ওড়িশায় কংগ্রেস যে ভূমিকা পালন করেছে তাতে তাদের ন্যক্কারজনক চরিত্রই বেরিয়ে এসেছে। ওড়িশা বিধানসভায় আস্থা ভোটে কংগ্রেস, বিরোধী ভূমিকায় দৃঢ় সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় হট্টগোলের মধ্যেই স্পিকার ধ্বনিভোটে সরকারকে জয়ী ঘোষণা করেন। এইভাবে অনাস্থা প্রস্তাবে ভোটাভুটির পরও সংখ্যালঘু বিজেডি সরকার টিকে যায়। লোকসভা ভোটের পর বিজেডি কংগ্রেসকে সরকার গড়তে সাহায্য করবে, এই বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সংখ্যালঘু বিজেডি সরকার ওড়িশার গদিতে বসে রয়েছে। কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস তাকে ঘাঁটাচ্ছে না। অন্যদিকে ৯ বছর ধরে চূড়ান্ত জনস্বার্থবিরোধী নীতি নিয়ে চলায় বিজেডির জনপ্রিয়তা শুধু তলানিতে ঠেকেছে তাই নয়, কন্ধমালের দাঙ্গার ঘটনার পর তার গায়ে সাম্প্রদায়িকতার তকমাও লেগেছে। এই পরিস্থিতিতে অসাম্প্রদায়িক মুখোশ আঁটার চেষ্টায় বিজেডি তড়িঘড়ি বিজেপি-র সঙ্গ ছেড়েছে। অথচ কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের যাবতীয় কুকর্মকে সমর্থন করে এসেছে বিজেডি, গুজরাট দাঙ্গার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেনি, এমনকী ওড়িশারই কন্ধমালে বিজেপির সৃষ্টি করা দাঙ্গা যাতে অবাধে চলতে পারে তার জন্য পুলিশকে অবধি নিষ্ক্রিয় রেখেছে।

ওড়িশার নির্বাচনী প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে সিপিএম ও সিপিআই-এর ভূমিকা উল্লেখ করতেই হয়। নিজেদের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট হিসাবে দাবি করে দু'বেলা মেহনতি মানুষের স্বার্থরক্ষার শপথ নিতে নিতে এই মেকি মার্কসবাদীদের বিজেডি-কে সমর্থন করার অজুহাত খুঁজে নিতে অসুবিধা হয়নি। তাদের মতে, বিজেপির সাথে জোট ছিন্ন করার সাথে সাথে বিজেডি ধর্মনিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে এবং বামপন্থীদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব হল নির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করতে বিজেডির হাত শক্ত করা।

ওড়িশার খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষের স্বার্থে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে বহুবার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। বাম নামধারী দলগুলি কখনও কখনও সাময়িকভাবে আন্দোলনের জোটে এলেও দীর্ঘস্থায়ীভাবে লাগাতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ার পথে যায়নি। ক্ষমতার লোভে জোট ভেঙে অন্যান্য বুর্জোয়া দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ওড়িশায় এস ইউ সি আই একাই সংগ্রামী বামপন্থা ও গণআন্দোলনের ঝাণ্ডা উর্ধ্বে তুলে রেখেছে এবং ক্রমেই আরও বেশি করে জনসাধারণের আস্থা ও সমর্থন অর্জন করছে।

জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার নাম করে ওড়িশায় বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া ও সোস্যাল ডেমোক্রেটিক শক্তিগুলি ক্ষমতা দখলের লালসায় যেকোনও ধরনের জোট গড়ে তুলতে দ্বিধা করছে না। নীতি-নৈতিকতা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এই দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে এ যুগের অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের দেখানো পথে উন্নত রুচি-সংস্কৃতি ও নীতি-নৈতিকতার আধারে এস ইউ সি আই জনস্বার্থ রক্ষায় একের পর এক আন্দোলন গড়ে তুলছে এবং ওড়িশা বিধানসভা নির্বাচনে একক শক্তিতে লড়াই করছে।

জয়নগর

ডাঃ তরুণ মণ্ডলের পক্ষে জনসমর্থন বেড়েই চলেছে

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত লোকসভা কেন্দ্রের মতো জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রেও সিপিএম-বিরোধী ঢেউ প্রবল। জয়নগর ও কুলতলি বিধানসভা এলাকা তো আছেই, ক্যানিং, গোসাবা, বাসন্তীর যে সব জায়গায় বিরোধীরা কথা বলার সাহস পেত না, নির্বাচনের সময় বিরোধী প্রার্থীরা এতকাল ঢুকতেই পারেননি, সেই সব কার্যত 'নিষিদ্ধ' এলাকাতে গত তিন দশকে এই প্রথম সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বিরোধী প্রার্থী হিসাবে ডাঃ তরুণ মণ্ডল সফর করছেন। সফর করছেন শুধু নয়, সেখানকার মানুষ তাঁকে নিয়ে উৎসবের মেজাজে মিছিল করছেন। সিপিএম ও আরএসপি-র হার্মাদদের দাপট ও অত্যাচারের সামনে যাঁরা গত তিন দশক নিজেদের ভোটটা দেওয়ার সুযোগ পাননি, তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত এস ইউ সি আই প্রার্থী কমরেড তরুণ মণ্ডলকে কেন্দ্র করে দেখছেন পালাবদলের স্বপ্ন। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী-সমর্থকেরা কমরেড তরুণ মণ্ডলকে জেতানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কমরেড মণ্ডলকে নিয়ে তাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন। সিপিএম ও আরএসপি-র নিচুতলার কর্মী-সমর্থকেরাও ব্যাপক সংখ্যায় এগিয়ে আসছেন। দেওয়াল লিখন, মিছিল, মিটিং, প্রার্থীকে নিয়ে সফর — সমস্ত বিষয়েই সিপিএম এবং আরএসপি-র থেকে এস ইউ সি আই এবং তৃণমূল কংগ্রেস জোট অনেক এগিয়ে। ডাঃ মণ্ডল যেখানেই যাচ্ছেন, প্রত্যেকটি বিধানসভা এলাকাতেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক ব্যবহার, বলিষ্ঠ বক্তব্য সবাইকে, এমনকী সিপিএম-আরএসপি দলের কর্মী-সমর্থকদেরও চমৎকারভাবে আকৃষ্ট করছে। একবাক্যে মানুষ বলছেন, ''ডাক্তারবাবুই 'ফিটেস্ট' প্রার্থী''। মিটিং-মিছিলে হাঁটা, ভাষণ দেওয়া ছাড়াও ডাঃ মণ্ডল অসুস্থ মানুষদের দেখছেন, চিকিৎসার পরামর্শ দিয়ে প্রেশক্রিপশন লিখে দিচ্ছেন। তাঁর আন্তরিকতার ছোঁয়ায় সিপিএম-আরএসপি-র কর্মী-সমর্থকরাও বলছেন, সাধারণ মানুষের পাশে এমন দরদ নিয়ে দাঁড়াতে কোনও প্রার্থীকে তাঁরা আগে দেখেননি। গাছতলা, চায়ের দোকান — যেখানেই তিনি দাঁড়াচ্ছেন বা বসছেন, সেখানেই মানুষ ভিড় করে তাঁর কথা শুনছেন, তাঁর কাছ থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ নিচ্ছেন।

চতুর্দিকে নদীবেষ্টিত গোসাবা বিধানসভা এলাকার কথা ধরাই যাক। তিন দশকের সিপিএম ও আরএসপি-র একচ্ছত্র আধিপত্যে থাকা এই বিধানসভা এলাকা বাস্তবিকই সভ্য জগত থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপমাত্র। পানীয় জল নেই, সেচ নেই, পাকা রাস্তা নেই। চার চাকার কোনও গাড়ি চলে না। চিকিৎসার ব্যবস্থা বলতে প্রায় কিছুই নেই। কলকাতায় বসে সংবাদমাধ্যমের সামনে, জনসভায় নেতা-মন্ত্রীরা উন্নয়নের ঢক্কানিনাদ করলেও, বাস্তবে গোসাবা ডুবে আছে গাঢ় অন্ধকারে। কমরেড তরুণ মণ্ডলকে কাছে পেয়ে গ্রামে গ্রামে মানুষ নিজেদের যন্ত্রণা ও সমস্যার কথা উজাড় করে দিচ্ছেন। কমরেড মণ্ডল তাঁদের কথা আগ্রহের সঙ্গে শুনছেন। নির্বাচনের পর জনস্বার্থে ৫ দফা দাবিতে গোসাবা জুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন পরিচালন যৌথ কমিটি, কমরেড তরুণ মণ্ডল সেই আন্দোলনের সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গ্রামের এক-একটি সভায় পাঁচশো থেকে তিন হাজারেরও বেশি মানুষ জড়ো হচ্ছেন। ছোট মোল্লাখালিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের অনুরোধে কমরেড মণ্ডল হিন্দিতে বক্তব্য রাখেন। সর্বত্র বক্তব্য শুনে মানুষ সোল্লাসে বলছেন, 'হ্যাঁ, এই প্রার্থীই পারবে আমাদের কথা দিল্লির পার্লামেন্টে তুলে ধরতে। ইনিই যোগ্য প্রার্থী।' সমগ্র গোসাবা জুড়ে এস ইউ সি আই প্রার্থী সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বক্তব্য, এমনকী বিরোধী দলগুলির স্থানীয় নেতা-কর্মীদেরও বক্তব্য— 'সম্প্রতিকালে এমন প্রার্থী আমরা পাইনি'। গত ১১ এপ্রিল আজাদ হিন্দ ক্লাবে সারাদিন ধরে ডাক্তার, শিক্ষক সহ গোসাবার বিশিষ্টজনদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেন কমরেড মণ্ডল। এ জিনিস গোসাবার মানুষ কখনও দেখেননি। অনেকেই বলছেন, মোট ১৪টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ১০টিতেই কমরেড মণ্ডল আরএসপি প্রার্থীর থেকে বেশি ভোটে জিতবেন এবং বাকি ৪টিতে সমানে সমানে লড়াই হবে।

২৫ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঘটকপুকুরে জয়নগর কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ তরুণ মণ্ডল এবং যাদবপুর কেন্দ্রের প্রার্থী কবীর সুমনের সমর্থনে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে উপস্থিত ডাঃ তরুণ মণ্ডল এবং এস ইউ সি আই ও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ

বাসন্তী বিধানসভা এলাকায় তিনদিন ঘুরেছেন কমরেড মণ্ডল। ছোট-বড় অসংখ্য সভা করেছেন। বাঁধভাঙা বন্যার মতো সমর্থন আসছে। গ্রামের পর গ্রাম মানুষ বেরিয়ে আসছে সমর্থন জানাতে। নেতাদের সাধ্য নেই সেই ঢেউ আটকায়। প্রায় প্রতিটি বুথেই বুথ-কমিটি তৈরি হয়ে গেছে, যা আগে কল্পনাই করা যেত না। প্রতিটি বুথ-কমিটিতে প্রচুর মানুষ রয়েছেন। এই বুথ কমিটিগুলিই হবে আগামী দিনের সংগ্রাম কমিটি। শাসকদল ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করছে, হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের মতলব সফল হচ্ছে না। সাধারণ মানুষ এককাট্টা। কর্মী বৈঠক থেকে ফেরার পথে আঠারোবাঁকি অঞ্চল নির্বাচনী কমিটির সভাপতি সাখাত নাইয়াকে সিপিএম-আরএসপি আশ্রিত সমাজবিরোধীরা প্রচণ্ড মারধর করে। আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। ফিরে এসে আবার তিনি নির্বাচনী কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে ৫০ হাজারেরও বেশি ভোটে জিতেছিলেন আরএসপি প্রার্থী। এবার কিন্তু চিত্র ভিন্ন।

ক্যানিং (পশ্চিম) বিধানসভা এলাকার ১১টি পঞ্চায়েতের বুথগুলির বেশ কয়েকটিতে গত তিন দশকে সাধারণ মানুষকে ভোটই দিতে দেয়নি সিপিএমের হার্মাদবাহিনী। অবাধে ছাপ্পা দিয়ে তারা বিধানসভায় সিপিএম প্রার্থীকে এবং লোকসভায় আরএসপি প্রার্থীকে জিতিয়েছে। বহু এলাকাতে বিরোধী প্রার্থীরা পর্যন্ত ঢুকতে পারেননি। সেইসব বুথ এলাকায় কমরেড তরুণ মণ্ডলকে নিয়ে সাধারণ মানুষ এবার মিছিল করছেন, পদযাত্রায় সামিল হচ্ছেন। কমরেড তরুণ মণ্ডল এলাকায় আসার পর এলাকার চেহারাটাই যেন বদলে গেছে। মানুষ বলছেন, 'হার-জিত তো পরের কথা, গ্রামে কোনও বিরোধী প্রার্থী প্রচারে এসেছেন, এতেই আমরা খুশি। এতকাল লোকসভা ভোটে কোনও প্রার্থীকে এই এলাকায় ঢুকতে পর্যন্ত দেখিনি।' সর্বত্র প্রচার-প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। সিপিএম একটা মাঝারি আকারের মিছিল করা ছাড়া এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত প্রকাশ্যে আর কিছুই করেনি। কমরেড মণ্ডলের প্রতি জনগণের সমর্থন এমনই প্রবল ও স্বতঃস্ফূর্ত যে, জনসমর্থনের প্রশ্নে প্রতিটি অঞ্চলেই তিনি এগিয়ে রয়েছেন।

ক্যানিং (পূর্ব) এলাকায়ও অসংখ্য মানুষ যোগদান করছেন এস ইউ সি আই এবং তৃণমূল কংগ্রেসের যৌথ প্রচার অভিযানে। প্রার্থী এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ যেভাবে সংবর্ধনা দিচ্ছেন, তা অন্যান্য এলাকার মতোই অপূর্ব। তাঁরা কমরেড তরুণ মণ্ডলের গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন ফুলের মালা। যে গ্রামে যে ফুল পাওয়া যায়, তাই দিয়েই মানুষ গেঁথে নিচ্ছেন তাঁদের সংবর্ধনার মালা। হাজারে হাজারে হাঁটছেন প্রার্থীর সঙ্গে। দুর্গাপুর, চন্দনেশ্বর-১ ও ২, তাড়দা, বোদরা, ভাঙড় সহ ক্যানিং (২)-এর প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানেই প্রার্থী যাচ্ছেন, সেখানেই মানুষ তাঁকে নিজেদের সহমর্মী হিসাবে গ্রহণ করছেন। এক সময় যেসব এলাকায় সিপিএম সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বিরোধীদের কোনও কথা বলতে দিত না, সেইসব জায়গায় এখন নির্বাচনী অফিস খোলা হয়েছে, প্রচারের কাজ চলছে। জনসভা ও পথসভাগুলিতে মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

কুলতলীর বিডিও-র অপসারণ দাবি

২১ এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য ও পরিষদীয় নেতা বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার কুলতলী বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় শাসকদল কর্তৃক রিগিং-এর বাস্তব আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন—

কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার কুলতলীর বি ডি ও-কে বদলি করছে না। এই বিডিও শ্রী সুভাষচন্দ্র শিকারি সরাসরি শাসক দলের হয়ে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বেপরোয়া রিগিং করতে সাহায্য করেছিলেন এবং বাস্তবে তাঁর অফিসটি শাসকদল বা তাদের শরিকদের অফিসে পরিণত হতে বাধা দেননি।

দেবপ্রসাদ সরকার বলেন, নির্বাচনকে অবাধ করার লক্ষ্যে, ভারতের নির্বাচন কমিশন রাজ্যের মুখ্যসচিবদের সঙ্গে বৈঠকের পর গত ৫ ফেব্রুয়ারি আদেশ দেন (অর্ডার নং ইসিআই/পি এন/৭/২০০৯)যেসমস্ত সরকারি অফিসার নিজের জেলায় কাজ করছেন, তাঁদের অবিলম্বে বদলি করতে হবে। অথচ বর্তমান বিডিও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কুলতলী ব্লকের বিডিও হিসাবে এখনও বহাল তবিয়তে কাজ করছেন এবং আমাদের বার বার অভিযোগ সত্ত্বেও তাঁকে বদলি করার কোনও উদ্যোগ আমরা দেখছি না। উল্লেখ্য, কুলতলীর বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদার গত ১৬ এপ্রিল মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে চিঠি দিয়ে তথ্যপ্রমাণ সহ অভিযোগ করেছেন, যার কোনও উত্তর আজও পাওয়া যায়নি।

এই বি ডি ও-র বিরুদ্ধে গুরুতর কিছু অভিযোগ জানানো হয়েছে। তিনি বেআইনিভাবে কর্মস্থলের ৬০ কিমি দূরে একটি সরকারি কোয়ার্টারে বাস করেন অথচ কর্মস্থলের ২০ কিমি-র মধ্যে তাঁর থাকার কথা। এছাড়াও, তিনি গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনায় কাজ করেছেন এমন শ্রমিকদের মজুরি দেননি, যা ডি এম-কে জানানো হয়েছে। তিনি মৈপিঠ-বৈকুণ্ঠপুরের কমপক্ষে ৬০ জন বন্যাদুর্গতের রিলিফ আত্মসাৎ করেছেন এবং তদন্তে এই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এছাড়াও জবকার্ডধারী সকলকে যেখানে কাজ দেওয়ার কথা সেখানে তিনি আদিবাসী ও অনাদিবাসীদের মধ্যে বৈষম্য করে কাজ দিচ্ছেন যার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বলে দেবপ্রসাদবাবুরা মনে করেন। বেছে বেছে বিরোধীদের তিনি প্রাপ্য মজুরি এবং বার্ধক্যভাতা থেকে বঞ্চিত করেছেন। এছাড়া তাঁর তত্ত্বাবধানে তৈরি ভোটার লিস্টে বেশ কিছু বাংলাদেশির নামও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, অথচ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাদের নাম ছিল এমন বেশ কিছু ভোটারের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে বিরোধী পক্ষের বলে ধরে নিয়ে।

এই অবস্থায়, এ আর ও হিসাবে এই বিডিও-র পরিচালনায় নির্বাচন হলে তা অবাধ হতে পারে না। তাই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী এই বিডিওর বদলি এবং কুলতলীতে অবাধ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার।

সুদানে আন্তর্জাতিক ছাত্র সম্মেলনে ডি এস ও

আফগানিস্তান ও ইরাকের পর মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবার সুদানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। সুদানের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ওমর আল্ বসিরকে সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গুলিহেলনে হেগের তথাকথিত আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে সুদানের পশ্চিম সীমানায় চাদ বা সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের লাগোয়া দারফুর প্রদেশে বিদ্রোহীদের মদত দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা সুদানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর মতলবে আছে। এর আগে বিশ্বের স্বঘোষিত অভিভাবক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সুদানে বিনা প্ররোচনায় একতরফা ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। তারা যুক্তি দেখায়, সুদান নাকি নিষিদ্ধ রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করছে। পরবর্তী তদন্তে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়, মার্কিন হানায় বিধ্বস্ত কারখানাটি আসলে জীবনদায়ী অ্যান্টিবায়োটিক তৈরির কারখানা। তথাকথিত আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত সুদানের রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করায় তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে সুদানের ছাত্রসমাজ। গত ৫-৬ এপ্রিল রাজধানী খার্তুমের ফ্রেন্ডশিপ হলে জেনারেল সুদানিজ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন তথাকথিত আন্তর্জাতিক আদালতের পরোয়ানার বিরুদ্ধে এক আন্তর্জাতিক ছাত্র সম্মেলন আহ্বান করে। আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের নানা ছাত্র ও যুব সংগঠনের সঙ্গে এ আই ডি এস ও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ মুখার্জী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। কিউবা, ঘানা, উগান্ডা, মরিশাস, ইরিথ্রিয়া, ইরাক, ইয়েমেন, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, লেবানন, নাইজেরিয়া, লিবিয়া ও ইথিওপিয়া থেকে আগত প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।

নানা দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও বুদ্ধিজীবীরা দারফুর সমস্যা সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট অধিবেশনে কমরেড সৌরভ মুখার্জী বলেন, প্রাক্তন মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল র‍্যামসে ক্লার্কের সভাপতিত্বে গড়ে ওঠা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে ডি এস ও সংগঠন অংশগ্রহণ করছে। সেই আন্দোলনকে আপনারা শক্তিশালী করুন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এস ইউ সি আই দলের কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড মানিক মুখার্জী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক।

৬ এপ্রিল সান্ধ্য অধিবেশনে মার্কিন আক্রমণের লক্ষ্য সুদানের রাষ্ট্রপতি আল্ বসির বিভিন্ন দেশের ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও বক্তব্য রাখেন। কমরেড সৌরভ মুখার্জী উপস্থিত প্রতিনিধিদের কমরেড শিবদাস ঘোষের রচনাবলী উপহার দেন।

৫-৬ এপ্রিল সুদানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে কমরেড সৌরভ মুখার্জী (প্রথম সারিতে ডানদিক থেকে দ্বিতীয়)

পিজিতে এস এফ আইয়ের হামলা

২৫ এপ্রিল এস এফ আই পি জি হাসপাতালের ছাত্রাবাসে ডি এস ও সমর্থকদের ওপর ব্যাপক হামলা চালায়। পুলিশে অভিযোগ জানালে পুলিশ উল্টে ডি এস ও সমর্থক ছাত্রদের গ্রেপ্তার করে। এর প্রতিবাদে ২৬ এপ্রিল হাসপাতালে ছাত্ররা মৌন মিছিল করে। ছবিতে আহত ডি এস ও কর্মী দীপজ্যোতি চৌধুরী পি জি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মন্দার কোপে মানুষ

দুয়ের পাতার পর

টেলিকমিউনিকেশন, ওষুধশিল্প, হোটেল-ট্যুরিজমের ব্যবসা প্রভৃতি। কিন্তু এ দেখে ভাবার কোনও কারণ নেই যে, সরকার যেভাবে মন্দার আঘাত থেকে পুঁজিপতিদের বাঁচাতে চাইছে, সেভাবেই সরকার জনগণকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে। এটা ভাবারও কারণ নেই যে, মন্দার আঘাত ভারতের জনগণের ওপর কম। কৃষি, শিল্প, পরিষেবা সহ অর্থনীতির সকল ক্ষেত্র বিশ্বমন্দায় আক্রান্ত। পুঁজিপতিদের লাভ হচ্ছে, না কি লোকসান হচ্ছে, এ দিয়ে মন্দা আছে কি নেই, তা বোঝা যাবে না। পুঁজিপতিদের লাভ হবেই, না হলে সরকার তার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু মানুষের ওপর নেমে আসবে ছাঁটাইয়ের কোপ। সরকার তার তহবিলের টাকা খরচ করবে পুঁজিপতিদের স্বার্থ অটুট রাখতে, মানুষের পকেট কেটে সরকার সেই টাকা তুলবে। মন্দার সমস্ত বোঝাটা তারা চাপিয়ে দেবে জনসাধারণের ঘাড়ে। সাধারণ মানুষের রেহাই নেই পুঁজিবাদী মন্দার আঘাত থেকে। যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে, তাকে চুষে খাবে হয় দেশীয়, না হয় বিদেশি একচেটিয়া পুঁজি। কাজেই সে রামের বাণে মরবে, নাকি রাবণের বাণে মরবে, তফাতটা বড়জোর এইটুকু।

ডাঃ তরুণ মণ্ডলের পক্ষে জনসমর্থন

পাঁচের পাতার পর

ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে মানুষ বক্তব্য শুনছেন। এই বিধানসভা এলাকায় সিপিএম-ফ্রন্টের প্রচার তেমন দেখা যাচ্ছে না। অনেক এলাকায় যেখানে হার্মাদবাহিনীর সাহায্যে সিপিএম নিয়মিত ছাপ্পা ভোট করায়, সেখানে সন্ত্রাসের পরিবেশের মধ্যেই মহিলারা বুথে বুথে কমিটি গড়ে তুলেছেন। প্রতিরোধের লক্ষ্যে তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন। বলছেন, ''আমরা মায়ের জাত। তাপসী, ইমদাদুলের মায়ের মতো আর কোনও মায়ের কোল খালি করতে দেব না''। মুসলিম মহিলারা বলছেন, ''আমরা তো রোজার সময় সারাদিন না খেয়ে থাকি, ভোটের দিনও না হয় অনাহারেই থাকব। ভোর থেকে বুথে থাকব। এবার আর চট খুলতে দেব না। আমাদের ভোট অন্যরা দিয়ে দেবে — তা এবার হতে দেব না।

মগরাহাট (পূর্ব) এলাকায় সুলেখা সিনেমা হল সেদিন উপচে সামনের রাস্তাঘাট ভরে উঠেছিল, যেদিন কমরেড তরুণ মণ্ডল হাজির হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস এবং এস ইউ সি আইয়ের যৌথ কর্মী সম্মেলনে। উপস্থিত ছিলেন টিএমসি-র জেলা সভাপতি অরূপ ভদ্র সহ ব্লকের ও অঞ্চলের নেতারাও। আমড়াতলা, সোহনপুর, ধামুয়া (দক্ষিণ), ধামুয়া (উত্তর), হোটর মর্যাদা, মুলটি, গোকর্ণি, যুগদিয়া, উড়েলচাঁদপুর, ডিহি কলস, নৈনান সহ বিভিন্ন এলাকা সফরে প্রার্থীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের ঢল নেমেছে মগরাহাট জুড়ে। অথচ, আরএসপি প্রার্থীকে নিয়ে সিপিএম মগরাহাট স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় যে মিছিল করল, তাতে তারা গাড়ি করে মাত্র শ' দেড়েক মতো লোক জড়ো করতে পেরেছিল। স্থানীয় মানুষ ছিল অতি সামান্য। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা জোট-প্রার্থীকে জেতাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এক তরুণ ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'জোট-প্রার্থী ডাঃ তরুণ মণ্ডল মগরাহাটে লিড দেবেনই।'

কুলতলী — রক্তক্ষয়ী তেভাগা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই বিধানসভা এলাকার গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠেছে এস ইউ সি আইয়ের সংগঠন। প্রথমে কংগ্রেস ও পরে সিপিএম এই এলাকায় গরিব মানুষের সংগঠনকে ভাঙতে লাগাতার আক্রমণ, খুন, সন্ত্রাস, নারীধর্ষণ, বিপুল টাকা ছড়ানো — কোনও কিছুই বাদ দেয়নি। বিভিন্ন সময়ে বহু এলাকায় তারা সংগঠনের অনেক ক্ষতি করেছে, খুন-সন্ত্রাসের আবর্তে মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে দিয়েছে, বহু মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেছে, মানুষ আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। মেরিগঞ্জ এলাকায় গত বিধানসভা নির্বাচনে ৫টি বুথ দখল করে সিপিএম-আরএসপি'র হার্মাদবাহিনী ছাপ্পা ভোট দিয়েছিল। এবার পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, ওদের বুথ দখলের ষড়যন্ত্র এলাকার মানুষ রুখে দেবেই। কংগ্রেসের সমর্থকরাও ডাঃ তরুণ মণ্ডলকে ভোট দেওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছে। মৈপীঠ অঞ্চল গত প্রায় ২০ বছর সিপিএম পুলিশ-প্রশাসন ও ভাড়াটে ক্রিমিনাল বাহিনীর সাহায্যে দখল করে রেখেছে। সেখানে এখন তারা নিজেদের কর্মীদেরই প্রচারের কাজে নামাতে পারছে না। তাদের পথসভাগুলিতে ৭-৮ জন করে লোক হচ্ছে। অন্যদিকে, এস ইউ সি আই এবং তৃণমূল কংগ্রেসের যৌথ প্রচার সভাগুলিতে ভিড় উপচে পড়ছে। নির্বাচনে হার্মাদবাহিনীর ছাপ্পা ভোট ঠেকাতে সাধারণ মানুষ দৃঢ়সঙ্কল্প ঘোষণা করেছে। নলগোড়া অঞ্চলে এস ইউ সি আই অফিসে এমন অনেক মানুষ এসে হাজির হচ্ছেন, যাঁরা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে নানা কারণে অন্য দলের হয়ে গোপনে কাজ করেছেন এবং জিতিয়েছেন। তাঁরা এসে এসব স্বীকার করে এস ইউ সি আই প্রার্থীর পক্ষে প্রকাশ্যে প্রচারে নামার শপথ নিচ্ছেন। জালাবেড়ে অঞ্চলের মানুষ একবাক্যে বলছেন, এবার জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে ডাঃ তরুণ মণ্ডল জিতছেনই। এই আত্মবিশ্বাস এত প্রবল যে, মানুষ ব্যাপক সংখ্যায় রাস্তায় নেমে পড়েছেন, প্রচার করছেন। তবে, একটা চাপা সন্ত্রাসের পরিবেশ রয়েছে। মানুষের আশঙ্কা, একেবারে শেষ মুহূর্তে সিপিএম তাদের হার্মাদবাহিনী নিয়ে সাধারণ মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না তো!

জয়নগর বিধানসভা এলাকায় এস ইউ সি আইয়ের সাংগঠনিক শক্তি তো আছেই, সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে, জনগণের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা গণকমিটিগুলি এবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ময়দা অঞ্চলে মদবিরোধী আন্দোলনের জন্য মহিলাদের ১৬টি কমিটি গঠিত হয়েছিল। ৬ মাস ধরে আন্দোলন চালিয়ে তাঁরা বহু মদের ঠেক ভেঙে দিয়েছেন। এস ইউ সি আই সহ অন্যান্য দলের মহিলারাও রয়েছেন এই কমিটিগুলিতে। তাঁরাও সবাই কমিটিগতভাবে ডাঃ মণ্ডলকে জেতানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। যে যে অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজন রয়েছে, সেখানে তাঁরাও সর্বশক্তিতে কাজে নেমে পড়েছেন। দক্ষিণ বারাসত, রাজাপুর-করাবেগ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রার্থীকে নিয়ে প্রচার মিছিল ও সভাগুলি জনসমুদ্রে পরিণত হচ্ছে। অন্যদিকে, সিপিএমের সভাগুলিতে শ্রোতার চেয়ে বক্তা বেশি।

সব মিলিয়ে যা পরিস্থিতি, তাতে এস ইউ সি আই-তৃণমূল কংগ্রেস জোট-প্রার্থী কমরেড তরুণ মণ্ডলের জয়লাভের সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে উঠেছে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সর্বস্তরের মানুষের কাছে। শেষ মুহূর্তে সিপিএমের হার্মাদবাহিনীর আক্রমণ যদি নেমেও আসে, জনগণ তার মোকাবিলা করবেই। এবারের পরিস্থিতি মোটেই বিগত বারগুলির মতো নয়। যতদূর সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, সিপিএমের হয়ে নানা এলাকায় গিয়ে যারা হার্মাদবাহিনীর হয়ে কাজ করত, তাদেরও অনেকেই এবার সিপিএমের ডাকে সাড়া দিচ্ছে না। অনেকে সরাসরি 'না' করে দিচ্ছে। সিপিএমকে হার্মাদ সরবরাহের এজেন্সি যারা চালায়, তাদের বক্তব্য — সিপিএমের হয়ে অধিকাংশই এখন কাজ করতে চাইছে না।

বৃত্তি পরীক্ষায় পাশের হার ৬৯.০৭ শতাংশ

সিপিএম ফ্রন্ট সরকার প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেবার ফলে এ রাজ্যে শিক্ষার মানের ক্রমাবনমন ঘটে চলেছে। তাকে প্রতিরোধ করে শিক্ষার মানোন্নয়নকল্পে রাজ্যের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও অগণিত সাধারণ মানুষের শিক্ষা আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে গড়ে উঠেছিল প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ। ১৯৯২ সাল থেকে পর্ষদ কর্তৃক চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। এবছরে অনুষ্ঠিত বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয় ২২ এপ্রিল। পর্ষদের সম্পাদক কার্তিক সাহা জানান, এবারে পাশের হার ৬৯.০৭ শতাংশ, যা গতবারের তুলনায় সামান্য বেশি। ছাত্র ও অভিভাবকদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের ফলে এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা পৌনে চার লক্ষে পৌঁছেছে। পর্ষদের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, বৃত্তিপ্রাপকদের মধ্যে ৬০০ জন ছাত্রকে ৩০ মে কেন্দ্রীয় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রায় চার লক্ষ টাকা অর্থমূল্যের বৃত্তি ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়।

অন্ধ্রে বিচ্ছিন্নতাবাদী টি আর এস-এর সঙ্গে জোট বাঁধতে সিপিএম-এর আটকায়নি

অন্ধ্রপ্রদেশে বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচন এবারও একইসঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই নির্বাচনে একদিকে রয়েছে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস, অন্যদিকে তেলেগু দেশম পার্টি, তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতি (টিআরএস), সিপিএম এবং সিপিআইয়ের 'মহাজোট', এ ছাড়া রয়েছে তেলেগু অভিনেতা চিরঞ্জীবীর সদ্যগঠিত পার্টি 'প্রজা রাজ্যম' এবং বিজেপি ও বিএসপি। এস ইউ সি আই গণআন্দোলনের রাজনীতির ভিত্তিতে একটি লোকসভা আসন সেকেন্দ্রাবাদ কেন্দ্রে দুটি বিধানসভা আসন খৈরাতাবাদ ও অনন্তপুর আরবান-এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল অন্ধ্রপ্রদেশে একটানা কংগ্রেসের শাসন ছিল। দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো এই রাজ্যেও কংগ্রেস জনজীবনের সমস্যা সমাধানে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়। কংগ্রেসের প্রতি সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে প্রয়াত এন টি রামারাও-এর নেতৃত্বে তেলেগু দেশম পার্টি (টিডিপি) তেলেগু আঞ্চলিকতাবাদের হাওয়া তুলে কংগ্রেসবিরোধী মানসিকতাকে কাজে লাগায় এবং ১৯৮৩ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করে ক্ষমতাসীন হয়। কিন্তু টিডিপি-ও কংগ্রেসের মতোই পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করায় সেও পুঁজিবাদ-সৃষ্ট জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানে স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হয়। ফলে ১৯৮৯ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আবার কংগ্রেস রাজ্যের ক্ষমতায় ফিরে আসে। তারপর থেকে একবার কংগ্রেস, একবার টিডিপি — এভাবে পাল্টাপাল্টি করে অন্ধ্রপ্রদেশের শাসন পরিচালিত হচ্ছে।

কোনও সংবাদমাধ্যমই এই প্রশ্নটা তুলছে না বা সচেতনভাবে এড়িয়ে যাচ্ছে, কেন কংগ্রেসের দীর্ঘ ৩৬ বছরের একদলীয় শাসনে, বা তারপর থেকে দীর্ঘ ২৬ বছর ক্রমাগত কংগ্রেস ও টিডিপির পালাক্রমে শাসনে জনজীবনের মূল সমস্যাগুলির সমাধান হয়নি, বা হচ্ছে না?

অন্ধ্রপ্রদেশে জনজীবনের অবস্থা খুবই করুণ। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধিতে মধ্যবিত্ত সহ সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত। হাজার হাজার শ্রমিক কাজ হারাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ ডিগ্রিধারী যুবক চাকরির জন্য প্রতীক্ষা করছে। তার চেয়েও বেশি সংখ্যায় রয়েছে অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত বেকার যুবক — যাদের কোনও কাজ নেই। প্রকাশম জেলার চিমাকুরথি ও মারখাপুরমে ৫০টি স্লেটপাথর খনি এবং ১৫০০০ অনুসারি শিল্প বন্ধ হওয়ার প্রহর গুণছে। অনন্তপুর জেলার ওবুলাপুরমে লৌহ আকরিক খনিগুলি ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বায়াদুরগামে এবং আশেপাশে বস্ত্রশিল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হাজার হাজার শ্রমিক বাড়ি ফিরে গেছে। হিন্দুপুরে মালিকরা ২৭টি কারখানা আচমকা বন্ধ করে দিয়েছে, হাজার হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে মন্দার কারণে চাহিদা পড়ে যাওয়ায় ৩০ লক্ষ টন লৌহ আকরিক বিশাখাপত্তনম বন্দরে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে, রপ্তানিতে পাঠানো যাচ্ছে না।

কৃষকদের অবস্থাও ভয়াবহ। সার, বীজ, কীটনাশকের দাম মারাত্মকভাবে বাড়ছে। ঋণগ্রস্ত হয়ে কৃষকরা সর্বস্ব হারিয়ে আত্মহত্যা করছে। কৃষকদের জমি জোর করে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে স্পেশাল ইকনমিক জোন বা 'সেজ'-এর জন্য। এই এসইজেড বাস্তবে একদিকে কৃষক উচ্ছেদের বুলডোজার, অন্যদিকে শ্রমিক বধের কশাইখানা। অন্ধ্রপ্রদেশে কংগ্রেস সরকার এরকম ৪০টিরও বেশি এসইজেড গঠনের কথা ভাবছে। সরকার ইতিমধ্যেই বিশাখাপত্তনম জেলার আরাকুলোয়ায় বক্সাইট আকরিক লুণ্ঠনের জন্য জিন্দাল গ্রুপকে অনুমোদন দিয়ে দিয়েছে। মেহবুবনগর জেলার পলোপল্লিতে হাজার হাজার বিঘা কৃষিজমি সেজের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। অনন্তপুর জেলার পারিগিতে ২৫০০ একর এবং গোল্লাপুরমে ১০০০ একর কৃষিজমি সেজের জন্য অধিগ্রহণ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

ব্রেস্টাল করিডর নেলোর এবং কাকিনাড়া থেকে বিশাখাপত্তনম পর্যন্ত সম্প্রসারণের নামে একটা বিশাল সেজ গঠন করা হয়েছে, যার ফলে ১ লক্ষ ৫০ হাজার একর ধানী জমি নষ্ট হবে এবং ১৪ লক্ষ মৎস্যজীবী পরিবার উচ্ছেদ হয়ে যাবে। এই করিডরে গড়ে তোলা হবে কেমিকেল এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, যার ফলে পরিবেশদূষণও ভয়াবহ রূপ নেবে।

গরিবকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা দেওয়ার নামে ওয়াই এস রাজশেখর রেড্ডির নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার বাস্তবে ব্যবসায়িক হাসপাতাল বা নার্সিংহোমগুলিকে বেশি মুনাফা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় সরকারি হাসপাতাল কম থাকার অজুহাত দেখিয়ে সরকার দারিদ্র-কবলিত মানুষদের চিকিৎসার জন্য ব্যবসায়িক হাসপাতালে যেতে বলছে এবং 'রাজীব গান্ধী আরোগ্যশ্রী' স্কিমের মূল লক্ষ্য দুপায়ে মাড়িয়ে রাজকোষ থেকে প্রাইভেট হাসপাতালগুলির মালিকদের টাকা দিচ্ছে। প্রয়োজন যখন সরকারি হাসপাতালগুলির উন্নতিসাধন এবং সেগুলিই সাধারণ মানুষের চিকিৎসার সুযোগের জন্য সম্প্রসারিত করা, তখন সরকার মালিকদের মুনাফা লোটার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

একই চিত্র শিক্ষার ক্ষেত্রেও। সরকার পরিচালিত শিক্ষায়তন গড়ে তোলার পরিবর্তে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। গত বছর ১০২০টা সরকারি প্রাইমারি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আরও ৬৫০০টি প্রাইমারি স্কুল বন্ধ করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে সরকার। সরকারি খরচে নতুন স্কুল খোলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সরকার ভাবছে, ২০১০ সালের মধ্যে স্কুলের সমস্ত আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার। এই হল কংগ্রেস সরকারের সর্বনাশা শিক্ষা পরিকল্পনা।

জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র আজ সঙ্কটগ্রস্ত। এইসব দলের দীর্ঘ শাসনে এই সমস্যার সমাধান দূরের কথা, পুঁজিবাদের বিশ্বস্ত সেবক হিসাবে তারা জনজীবনে সংকটের বোঝা ক্রমাগত বাড়িয়েই গেছে। এই সংকটজনিত ক্ষোভ থেকে জনসাধারণ যাতে সংকটের কারণ অন্বেষণের দিকে না যায় এবং যথার্থ বিপ্লবী শক্তির নেতৃত্বে গণআন্দোলনে ফেটে না পড়ে, সেই কারণে জনসাধারণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে বুর্জোয়ারা এবং তাদের ধারকবাহক নানা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বিপজ্জনক প্রবণতাগুলিকে খুঁচিয়ে তোলে। অন্ধ্রপ্রদেশেও এইভাবে তেলেঙ্গানা ভাবাবেগকে খুঁচিয়ে তোলা হয় এবং তারই ভিত্তিতে অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের দাবিতে সোচ্চার হয় চন্দ্রশেখর রাওয়ের তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতি (টিআরএস)।

তেলেঙ্গানা অঞ্চল অত্যন্ত পশ্চাদপদ। রায়ালসীমা, উত্তর অন্ধ্র এবং উপকূলীয় জেলাগুলির কিছু অংশ সমন্বিত এই তেলেঙ্গানা অঞ্চলে পশ্চাদপদতার জন্য মানুষের মধ্যে ক্ষোভ প্রবল। এই ক্ষোভ খুবই সঙ্গত। কিন্তু এক জায়গায় উন্নয়ন, অন্যত্র পশ্চাদপদতা — পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার একটি অনিবার্য পরিণাম। পুঁজিবাদে শহরের তুলনায় গ্রাম হয় পশ্চাদপদ। অনুন্নত এলাকাগুলিকে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলা, যা সরকারকে বাধ্য করবে কিছুটা হলেও উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে। বলাবাহুল্য, এ কাজটি করার দায়িত্ব বর্তায় ঐতিহাসিকভাবে বামপন্থী দলগুলির। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য, অন্ধ্রপ্রদেশে সিপিএম, সিপিআই এই আন্দোলন গড়ে তোলার পথে না গিয়ে কয়েকটি আসন লাভের জন্য পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবিদার বিচ্ছিন্নতাবাদী টিআরএসের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করেছে। এই দুটি দল ২০০৪ সালে টিডিপি নেতা চন্দ্রবাবু নাইডুর বিরুদ্ধে অন্ধ্রপ্রদেশকে বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক দেওয়ার যে অভিযোগ তুলেছিল, এবারের তার সঙ্গেই 'শুভজোট' গড়ে তুলেছে। ২০০৪ সালে সিপিএম, সিপিআই জোট করেছিল, এবারের নির্বাচনে তাদের 'শত্রু' কংগ্রেসের সঙ্গে। আবার নির্বাচনের পর কংগ্রেসকে সরকার গঠনে সমর্থনের পথও সিপিএম খোলা রেখেছে। ফলে যে কোনও ভাবেই হোক ক্ষমতাভোগের নীতিহীন রাজনীতির চর্চায় অন্যান্য বুর্জোয়া দলের থেকে বামপন্থার দাবিদার এই দলগুলির কি কোনও পার্থক্য আছে?

সর্বত্র বিকল্প বামপন্থী রাজনীতি গড়ে তোলার পথে সিপিএম আজ মস্ত বড় বাধা। ২০০০ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে এস ইউ সি আই উদ্যোগ নিয়ে কতকগুলি বামপন্থী পার্টিকে যুক্ত করে বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এই আন্দোলন জনগণের মধ্যে বেশ সাড়াও ফেলেছিল। জনগণের মধ্যে এই আন্দোলন '৯ দলীয় আন্দোলন' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন প্রসারিত হয়ে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং কৃষকদের নানা দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে তোলে তাও গতিবেগ লাভ করেছিল। ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিনী আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও এই জোট সোচ্চার হয়েছিল। বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন যখন এইভাবে মানুষের ভাবনার জগতে একটা প্রত্যাশা গড়ে তুলেছে, ঠিক সেইসময় ২০০৪ সালে নির্বাচন ঘোষণার মুহূর্তে সিপিএম, সিপিআই '৯ দলীয় আন্দোলন' থেকে সরে যায় এবং কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী বোঝাপড়া গড়ে তোলে। বাস্তবে সিপিএমের গদির লোভের রাজনীতির জন্যই রাজ্যে রাজ্যে নানান জাতিবাদী দল, আঞ্চলিকতাবাদী দল, পৃথক রাজ্যের দাবিদার দল ইত্যাদি শক্তির সঙ্গে জোটবন্ধনের কারণে বামপন্থী আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না।

মহান মার্কসবাদ লেনিনবাদ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে এস ইউ সি আই অন্ধ্রপ্রদেশেও একক শক্তিতে শোষিত জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে একটার পর একটা গণআন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই আন্দোলনের ফলে কিছু কিছু দাবিও আদায় করা সম্ভব হয়েছে। শ্রীকাকুলাম জেলায় মধুবালসা সেচ প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, রাজ্যের রেশম শিল্পের শ্রমিকদের নিয়মিত করা; কুর্নুলে বিড়ি শ্রমিকদের বেতনবৃদ্ধি, অনন্তপুর জেলার খরা কবলিত এলাকায় ছাত্রদের ফি মকুব করা, অনন্তপুর জেলা এস কে ইউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা ফি-বৃদ্ধি বাতিল করা, দুর্নীতিগ্রস্ত নাইটিঙ্গেল স্কুল অব নার্সিং বন্ধ করে ছাত্রীদের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো, পলিটেকনিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা চালু করা, অনন্তপুরে ও হায়দরাবাদে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা বন্ধ করা, অশ্লীল বিজ্ঞাপন, সিনেমা বন্ধ করা সহ বিভিন্ন দাবি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আদায় হয়েছে। এই আন্দোলনের অংশ হিসাবে এস ইউ সি আই এই নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করছে। বুর্জোয়াদের ক্ষমতালোভী রাজনীতির বিপরীতে এস ইউ সি আইয়ের সংগ্রামী ভূমিকার প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে। এস ইউ সি আইয়ের নির্বাচনী বক্তব্য সাধারণ মানুষের মধ্যে খুবই সমর্থন লাভ করছে। যত বেশি করে সাধারণ মানুষ এই দলের দিকে আসবে, জনজীবনের দাবি নিয়ে আন্দোলনও তত তীব্রতর হবে। এই শক্তিই একদিন অন্যান্য রাজ্যের মতো অন্ধ্রপ্রদেশেও জন-স্বার্থরক্ষার আন্দোলনের প্রাণশক্তিতে পরিণত হবে।

অন্ধ্র সরকারের প্রতিনিধিরা নিরুত্তর ছিলেন

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই রাজশেখর রেড্ডি নিজস্ব প্রচারের স্বার্থে গত বছর পশ্চিমবঙ্গে একটি পরিষদীয় দল পঠিয়েছিলেন। তাঁরা এস ইউ সি আই-এর কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, রাজশেখর রেড্ডির নেতৃত্বে অন্ধ্রের গ্রামীণ জীবনে অভূতপূর্ব কাজ হয়েছে। দলের প্রতিনিধিরা প্রশ্ন করেন, এই অভূতপূর্ব কাজ সত্ত্বেও অন্ধ্রে কৃষকরা আত্মহত্যা করছে কেন? এই প্রশ্নে তাঁরা নিরুত্তর হয়ে যান।

ক্যানিং পূর্বের গঙ্গাপুর গ্রামে
বিদ্যুৎগ্রাহক আন্দোলনের বিরাট জয়

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভোজেরহাট সংলগ্ন তারদা অঞ্চলের গঙ্গাপুর গ্রামের ট্রান্সফর্মারটি দীর্ঘ ২ মাস যাবৎ বিকল হয়ে পড়ে ছিল। এর ফলে এই প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ, বয়স্ক ও শিশুসহ অগণিত মানুষ চরম অসুবিধার মধ্যে পড়েন। গ্রামবাসীদের বহু আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ গ্রাহকদের ট্রান্সফর্মার পরিবর্তনের দাবিকে কোনও গুরুত্ব দেয়নি। সরকারি দলও এ বিষয়ে তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যায়।

এই অবস্থায় গ্রাহকেরা নিরুপায় হয়ে বিদ্যুৎগ্রাহকদের একমাত্র সংগ্রামী সংগঠন 'অ্যাবেকা'র সাহায্য প্রার্থনা করেন। গ্রাহকদের আবেদনে সাড়া দিয়ে অ্যাবেকার রাজ্য নেতৃত্ব ২৩ মার্চ গঙ্গাপুর গ্রামে গ্রাহক সভা ডাকেন। উক্ত সভা থেকে একটি গ্রাহক কমিটি গঠিত হয় এবং ৩০ মার্চ শতাধিক গ্রাহক বিকল ট্রান্সফর্মার পরিবর্তনের দাবিতে এস ই ডি সি এল ভাঙড় অফিসের এস এম-কে ঘেরাও করেন।

৮ ঘণ্টা ঘেরাওয়ের পর এস ই ডি সি এল-এর চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপে অবিলম্বে ট্রান্সফর্মার বদলে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলে ঘেরাও প্রত্যাহার করা হয়। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন গঙ্গাপুর গ্রাহক কমিটির পক্ষে জলিল ঢালী, ডঃ আসান, হাসেম আলি ও অন্যান্য কর্মকর্তারা। অ্যাবেকার রাজ্য নেতৃত্বের তরফ থেকে নেতৃত্বে ছিলেন শিবাজী দে ও অসিত দাস দাস। কিন্তু প্রতিশ্রুতি মতো এক সপ্তাহের মধ্যে ট্রান্সফর্মার বদল না করায় ক্ষুব্ধ গ্রাহকেরা আবার ১৭ এপ্রিল এ ই-কে ঘেরাও করে। অবশেষে ২০ এপ্রিল নতুন ট্রান্সফর্মার লাগানো হয়।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

লালগড়ের আদিবাসীদের বিশাল মিছিল থেকে আন্দোলন তীব্র করার আহ্বান

লালগড় আন্দোলন এক নতুন মাত্রা পেল। ২৪ এপ্রিল হাজার হাজার নারী-পুরুষ কলকাতা কাঁপিয়ে তাদের আন্দোলনের বার্তা জানিয়ে দিয়ে গেল। নভেম্বর মাসের গোড়া থেকে দীর্ঘ প্রায় ৬ মাস জুড়ে এককাট্টা লড়াই চালিয়ে এসেছে তথাকথিত অশিক্ষিত আদিবাসী মাহাত সম্প্রদায় সহ সর্বস্তরের জঙ্গল মহলের মানুষগুলি। পুলিশ ও সিপিএমের দীর্ঘদিনের যৌথ অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং ৬ নভেম্বর অত্যাচারী পুলিশের প্রকাশ্যে অপরাধ স্বীকার সহ ২৩ দফা দাবিতে চলছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পুলিশ বয়কট ও বিক্ষোভ মিছিল এবং সভা-সমাবেশ। কোনও অজুহাতেই পুলিশ ঢুকতে পারেনি। সিপিএম হার্মাদ ঢোকানোর চেষ্টা করে বারে বারে বিফল হয়েছে। এলাকায় মানুষ প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তুলেছে। ক্রমেই আন্দোলনের তীব্রতা বেড়েছে।

অবশেষে সরকার নির্বাচনের অজুহাত তুলে পুলিশ ঢোকানোর কৌশল নিলে পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি অনড় থাকে তাদের দাবিতে। কোনওমতেই পুলিশ ঢোকানো চলবে না, যতক্ষণ না পুলিশ অপরাধ স্বীকার করে। এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ রাজ্য সরকারের পুলিশ ঢুকিয়ে আবার একটা নন্দীগ্রাম সৃষ্টির চক্রান্ত রোধে এগিয়ে আসার জন্য রাজ্যপালের কাছে দাবি জানান। অবিলম্বে লালগড় আন্দোলনের দাবিগুলি সুষ্ঠু সমাধানে যাতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়, সেজন্য স্তরে স্তরে রাজ্য সরকারের কাছে চাপ সৃষ্টি করা হয়। অবশেষে নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকার ও আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ২২ এপ্রিল এক বৈঠক করে এবং ঠিক হয়, 'পুলিশ বয়কট এলাকা'য় পুলিশ ঢুকবে না। এলাকার বাইরে রামগড়, লালগড়, পিড়াকাটা এবং ভীমপুরে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে ঐ এলাকায় ভোটারদের ভোট গ্রহণ করা হবে। সরকার গাড়ির ব্যবস্থা করে ভোটারদের নিয়ে আসবে এবং পৌঁছে দেবে। এটা লালগড় আন্দোলনের একটি অসাধারণ জয়ের দৃষ্টান্ত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ২৪ এপ্রিল কলকাতায় কলেজ স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে রানি রাসমণি রোডে এক বিশাল সমাবেশে সামিল হয়। উদ্যোক্তা পুলিশি সন্ত্রাসবিরোধী জনসাধারণের কমিটি এবং লালগড় সংহতি মঞ্চ। মিছিলে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সামিল হন। উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল, অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্ত, সুজাত ভদ্র, অধ্যাপিকা চৈতালী দত্ত, অধ্যাপক অরূপ দাশগুপ্ত প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সুমিত চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন লালগড় আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ছত্রধর মাহাত, লালমোহন টুডু, সিদু সরেন, পূর্ণিমা হেমব্রম এবং এস ইউ সি আই-এর অমল মাইতি প্রমুখ।

২৩ দফা দাবি নিয়ে সুষ্ঠু সমাধানের সরকারি প্রতিশ্রুতি রক্ষিত না হলে নির্বাচনের পর জুনের প্রথম সপ্তাহে আরও বৃহত্তর আন্দোলন হবে বলে ছত্রধর মাহাত সমাবেশে ঘোষণা করেন।

সভা চলাকালীন সংবাদ আসে, লালগড় থেকে আসা মানুষদের ৬টি বাস কলকাতা পুলিশ ভাঙচুর করেছে। সংবাদ শোনামাত্র দাবি ওঠে অপরাধী পুলিশদের ঘটনাস্থলে ক্ষমা চাইতে হবে। সাথে সাথে সমস্ত মানুষ অবরোধ করেন চৌরঙ্গি এস এন ব্যানার্জী ক্রসিং। মুহূর্তে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ চলার পরে রাত্রি ৯টায় ডি সি ট্রাফিক অপরাধী পুলিশের শাস্তি দেবেন কথা দিলে অবরোধ প্রত্যাহৃত হয়। ছত্রধর মাহাত বলেন, রাজ্য পুলিশের সাথে জঙ্গলমহলের মানুষের উপর অত্যাচারে যুক্ত হয়ে গেল কলকাতা পুলিশ। আন্দোলন রাজ্যের সর্বত্র বিস্তৃত করা হবে।

নিজেকে বড় বিপ্লবী হিসাবে গড়ে তুলুন

কমরেড সুকোমল দাশগুপ্তের আহ্বান

একের পাতার পর

''উপনিবেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ পুঁজিবাদের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে আছে। তারপরে যুদ্ধ হয়েছে। তারপরে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। এ দেশের পুঁজিবাদ বিকাশের পথে একচেটিয়া পুঁজিবাদের চরিত্র অর্জন করেছে। এই একচেটিয়া পুঁজি ব্যাঙ্কিং পুঁজির সাথে মিলনের মধ্য দিয়ে ভারতে ধনকুবের গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। পণ্য রপ্তানি থেকে ভিন্ন পুঁজি রপ্তানির মধ্য দিয়ে ভারত সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। ইতিহাসের অমোঘ পরিণতি হল, যে ভারত একদিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, আজ সে নিজেই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে।

কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা দেখি, সিপিআই নেতৃত্ব কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক নেতৃত্বকে অন্ধভাবে অনুসরণ করত। কমরেড ঘোষ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক নেতৃত্বকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু সেই নেতৃত্বের কোনও ভুল চোখে পড়লে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রেখেই তা দেখিয়েও দিয়েছেন। বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখিনতা থেকে নেতৃত্বকে ত্রুটিমুক্ত ও শক্তিশালী করার জন্যই নেতৃত্বের সমালোচনা তিনি করেছেন। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরাট অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও চিন্তাগত ক্ষেত্রে যে যান্ত্রিকতা কাজ করেছে, সেটা কমরেড ঘোষ দেখিয়েছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর 'সাম্যবাদী শিবিরের আত্মসমালোচনা' বইয়ে দেখিয়েছেন, যদি এই ত্রুটিগুলো দূর না করা যায়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে যে কোনও সময়ে এক দেশের কমিউনিস্টদের সঙ্গে অপর দেশের কমিউনিস্টদের দ্বন্দ্ব-কলহ শুরু হয়ে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিতে পারে। আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, সেই অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে।

আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে আধুনিক সংশোধনবাদ যে প্রধান বাধা — কমরেড শিবদাস ঘোষ তাও দেখান ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার সঠিক পথনির্দেশ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি বলেছেন, শোধনবাদ, সুবিধাবাদ, সংস্কারবাদ এবং সোস্যাল ডেমোক্রেসির নানা ধারা, যা ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনকে কুরে কুরে খাচ্ছে — তার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। তিনি দেখিয়েছেন, যতদিন পর্যন্ত পলিটিক্যাল পাওয়ার অফ দি পিপল্, অর্থাৎ জনতার রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব না হয় — ততদিন পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে গণসংগ্রাম ও শ্রেণীসংগ্রামগুলো পরিচালনা করতে হবে। ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার।

আমাদের দেশে অনেক বুদ্ধিজীবী আছেন, যাঁরা গান্ধীজিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, সাধারণ শোষিত মানুষের প্রতি গান্ধীজির মমত্ববোধ ছিল, তিনি হিপক্রিট বা ভণ্ড ছিলেন না। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে কোনও ব্যক্তির চিন্তা যেহেতু শ্রেণীচিন্তা হতে বাধ্য, তাই গান্ধীজির অজান্তেই তাঁর চিন্তা ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর চিন্তা। একথা ঠিক, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বিকাশের স্বার্থে কারিগরি বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রয়োজন। কিন্তু জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, এই প্রশ্নে গান্ধীজি বৈজ্ঞানিক ভাবধারা গ্রহণ করতে সক্ষম হননি। সেক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অধ্যাত্মবাদী। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, এই অধ্যাত্মবাদ বা তমসাচ্ছন্ন ভাবনা-ধারণার সঙ্গে বিজ্ঞানের কারিগরি দিকের মিশ্রণেই ফ্যাসিবাদ গড়ে ওঠে। তিনি আরও বলেছেন, কোনও দেশে ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠলে মানুষ গড়ে ওঠার পথে তা বাধা সৃষ্টি করে। কমরেড ঘোষের এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে।

১৯৪৮ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে এস ইউ সি আই দলের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ সেই দল দেশের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। এটা আমাদের গর্বের বিষয়, কিন্তু অহংকারের বিষয় নয়। এটা খেয়াল রাখতে হবে। আজ যেভাবে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, সেখানে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইকে প্রসারিত করার চেষ্টা আমরা করছি। আমাদের দলের প্রচেষ্টায় সম্প্রতি লেবাননের রাজধানী বেইরুটে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে যোগ দিতে নানা দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের যোদ্ধারা এসেছেন এবং তাঁরা সকলেই এই উদ্যোগকে তারিফ করেছেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতি বছর সাধারণ কর্মীদের নিয়ে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির পরিচালনা করতেন। রামকৃষ্ণের কালী দর্শনের মতো সাধারণ প্রশ্ন থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক নানা প্রশ্ন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের অত্যন্ত জটিল বিষয়গুলো সেখানে তিনি আলোচনা করতেন। হাইজেনবার্গের অনির্দেশ্যবাদের তত্ত্ব (uncertainty principle) বা ডি ব্রগলির ওয়েভ-পার্টিকেল ডুয়ালিটি তত্ত্ব, এসব মার্কসবাদের আলোকে কমরেড ঘোষ ব্যাখ্যা করেছেন। জাঁ পল সার্ত্রের নাম আপনারা অনেকেই শুনেছেন, তিনি নিরিশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি একসময় বলেছিলেন, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদই একমাত্র কম্প্রিহেনসিভ ফিলসফি। কিন্তু নিজের জীবনে সংগ্রাম ঠিকমতো পরিচালনা করতে না পারার জন্য তিনি হয়ে পড়লেন অস্তিত্ববাদী, কমিউনিস্ট হতে পারলেন না। এটাও আমাদের কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন।

কমরেডস্, আমাদের সামনে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের বিশাল কাজ পড়ে আছে। কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে যে, নিজেদের ত্রুটিমুক্ত করার সংগ্রাম আরও তীব্রভাবে পরিচালনা করতে হবে। এটা শুরু হয়েছে সব জায়গায়। কিন্তু দল যেমন চায়, তেমন সুনিপুণভাবে সেটা পরিচালিত হচ্ছে না। এই সংগ্রামকে আমাদের সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে, নিজেদের ত্রুটিমুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ, এককথায় বলতে গেলে আমরা দু'ধরনের লড়াইয়ের মধ্যে আছি। একদিকে গণআন্দোলনকে গড়ে তোলা, শক্তিশালী করা; অন্যদিকে নিজেদের বড় বিপ্লবী হওয়ার সম্ভাবনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই কাজগুলো ঠিকমতো করার মধ্যেই রয়েছে ২৪শে এপ্রিল পালনের সার্থকতা। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

কেন্দ্রীয় অফিসে অনুষ্ঠান

কেন্দ্রীয় অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন করছেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও সেন্ট্রাল স্টাফ কমরেড রণজিৎ ধর

এ বছর ২৪ এপ্রিল ৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সর্বত্র দলের অফিসগুলিতে রক্তপতাকা উত্তোলন, কমরেড শিবদাস ঘোষের ব্যাজ পরিধান, প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও তাঁর রচনা পাঠ করা হয়। এই উপলক্ষে দলের কেন্দ্রীয় অফিস ৪৮ লেনিন সরণীতে ঐদিন সকাল ১০টায় দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড মানিক মুখার্জী, অফিসের সমস্ত স্টাফ, গণদাবী প্রেসের কমরেডরা ও অন্যান্য কিছু কমরেডের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে পালিত হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, সেন্ট্রাল স্টাফ কমরেড রণজিৎ ধর। তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। গণদাবী পত্রিকায় প্রকাশিত কমরেড শিবদাস ঘোষের রচনার নির্বাচিত অংশ পাঠ করা হয়।

কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় ও আন্তর্জাতিকের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in